পুলিশ সম্পর্কে ১০১ প্রশ্নোত্তর

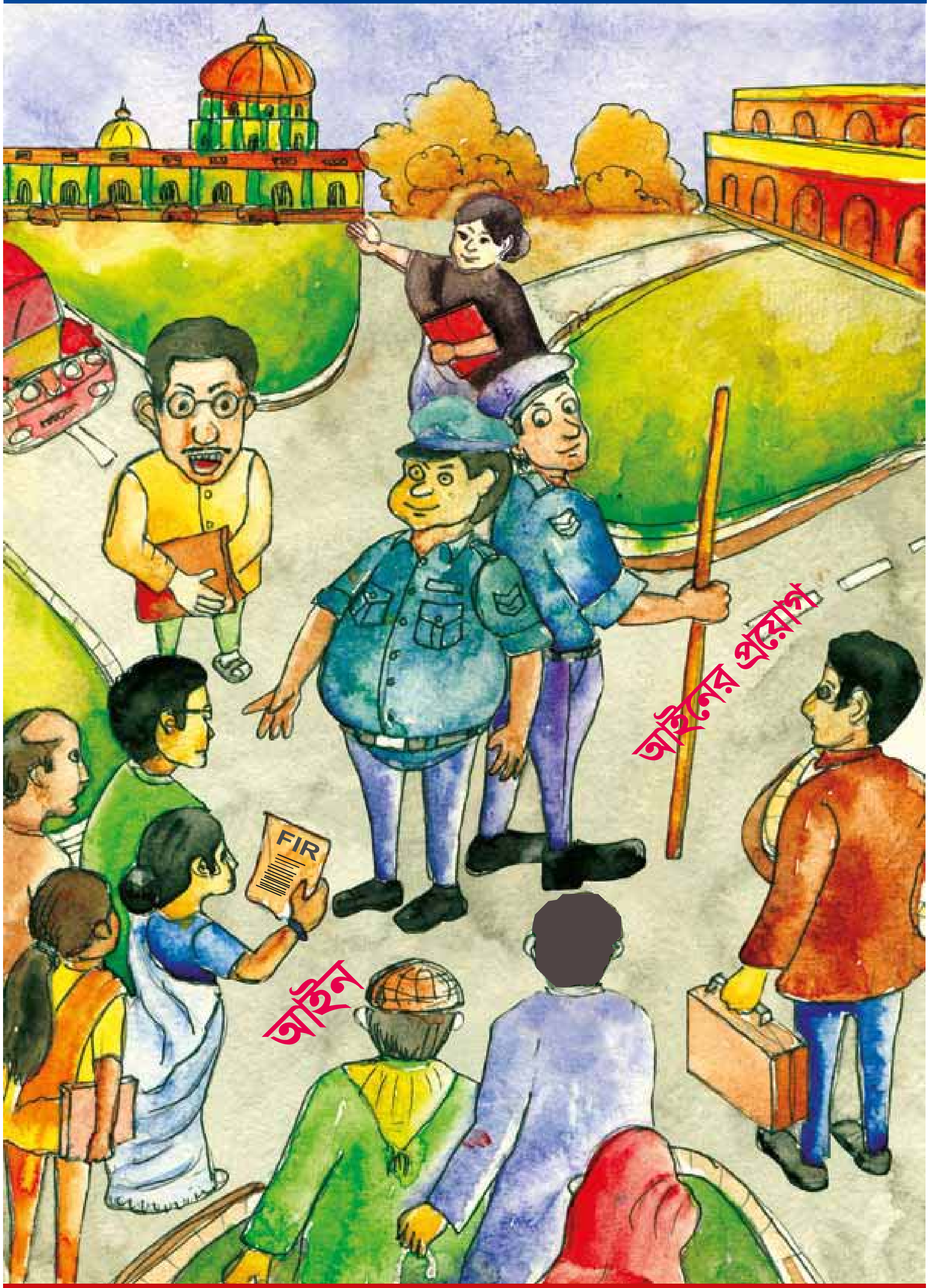

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সি এইচ আর আই)

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) হলো একটি স্বাধীন, দল নিরপেক্ষ, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে মানবাধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন। কমনওয়েলথভুক্ত কয়েকটি পেশাজীবী সংস্থার* যৌথ উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে সিএইচআরআই-এর প্রতিষ্ঠা। উল্লেখিত সংস্থাগুলো এই উপলব্ধিতে এসেছিল যে, কমনওয়েলথ যখন তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মানবাধিকার উন্নয়নে কাজের জন্য কিছু একক মূল্যবোধ ও আইনগত নীতিমালা বেঁধে দেয় এবং তার আলোকে যখন ভিন্ন ভিন্ন ফোরাম কাজ করে তখন সামগ্রিক অগ্রগতি ঘটে ক্ষীণ। সেই অবস্থার উত্তরণে সিএইচআরআই-এর যাত্রা।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সনদ সম্পর্কে সচেতনতা ও এর প্রতি আর্থসামাজিক বিশ্বস্ততা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছাড়াও 'হারারে নীতিমালা'সহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য মানবাধিকার নীতি-ঘোষণা-কাঠামোর বাস্তবায়ন ও অনুসরণ উদ্যোগ শক্তিশালী করাকে সিএইচআরআই তার কাজের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিল।

এসব লক্ষ্য অর্জনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে সিএইচআরআই নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন রিপোর্ট ও 'পেরিওডিক রিভিউ' প্রকাশ করছে। মানবাধিকারের বিপন্নতা থেকে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সমাজ জীবনকে রক্ষা করতে উদ্যোগ গ্রহণ ও পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সিএইচআরআই কমনওয়েলথ সচিবালয়, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকার ও নাগরিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে কাজ করে। সিএইচআরআই-এর কর্মসূচিগুলোর মাঝে রয়েছে মানবাধিকার বিষয়ক জনশিক্ষা কার্যক্রম, বিভিন্ন নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে সংলাপের আয়োজন, তুলনামূলক গবেষণা, প্রচারণা ও পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে তোলা। লক্ষ্য অর্জনে সিএইচআরআই বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার মাঝে মূলত অনুঘটকের ভূমিকা নিয়ে থাকে।

সিএইচআরআই-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থাগুলো জাতীয় পর্যায়ে কাজের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কেরও সদস্য হতে পারে। পেশাজীবীদের এসব সংস্থা তাদের কাজে মানবাধিকারের মানদন্ড অনুসরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পরিসরে অনুরূপ মানদন্ড অনুসরণের তাগিদ তৈরি করে থাকে। মানবাধিকার বিষয়ক তথ্যাদি, অনুসরণীয় মানদন্ড প্রচারের ক্ষেত্রেও তারাই প্রধান মাধ্যম। এসব গ্রুপ মানবাধিকার ইস্যুগুলোকে প্রচারণায় নিয়ে আসা ও লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগায় এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে লবি করে থাকে। মানবাধিকারের বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি ঐকতান সৃষ্টি করে চলেছে তারা।

সিএইচআরআই-এর প্রধান দপ্তর ভারতের দিল্লিতে। একই সঙ্গে লন্ডন ও ঘানার আক্রাতেও এর কার্যালয় রয়েছে। এর একটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টামন্ডলী রয়েছে। এছাড়া দিল্লি, লন্ডন ও ঘানাভিত্তিক তিনটি কার্যকরী কমিটি রয়েছে।

পরিচালক
মাজা দারুওয়ালা

আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিশন
যশপাল ঘাই - চেয়ারপার্সন

সদস্যমন্ডলীঃ
এলিসন ডুকসব্যারী, নেভিল লিন্টন, ভিভেক মারু, এডওয়ার্ড মর্টিমার, স্যাম ওকুদজেটো, ওয়াজাত হাবিবুল্লাহ, মাজা দারুওয়ালা

নির্বাহি পরিষদ (ভারত)
ওয়াজাত হাবিবুল্লাহ, চেয়ারপার্সন

সদস্যমন্ডলী
বি. কে. চন্দ্রশেখর, নিতিন দেশাই, সঞ্জয় হাজারিকা, কমল কুমার, পুনম মুন্তেরেজা, রুমা পাল, জেকব পুন্নস্, এ. পি. শাহ, বি. জি. ভার্গিস, মাজা দারুওয়ালা

নির্বাহি পরিষদ (ঘানা)
স্যাম ওকুদজেটো, চেয়ারপার্সন

সদস্যমন্ডলী
অকোতো এ্যাম্পাও, যশপাল ঘাই, ওয়াজাত হাবিবুল্লাহ, নেভিল লিন্টন, এডওয়ার্ড কফি কোয়াসিঙ্গা, জুলিয়েট টুওয়াকি, মাজা দারুওয়ালা

নির্বাহি পরিষদ (যুক্তরাজ্য)
নেভিল লিন্টন, চেয়ারপার্সন

সদস্যমন্ডলী
রিচার্ড বর্নি, মীনাক্ষী ধর, ডেরেক ইনগ্রাম, সৈয়দ শরফুদ্দিন, জো সিলভা, মাইকেল স্টোন, স্যালি-অ্যান উইলসন

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ

সিএইচআরআই প্রধান কার্যালয়,
নয়াদিল্লি
55/A Siddharth Chambers, Third Floor
Kalu Sarai
New Delhi 110016
Ph: 91 11 43180200; 43180201
Fax: 91 11 26864688
Email: info@humanrightsinitiative.org
<info@humanrightsinitiative.org>

সিএইচআরআই ইংল্যান্ড,
লন্ডন কার্যালয়
Institute of Commonwealth Studies
28, Russell Square
London WC1B 5DS, UK
Tel: +44-020-7-862-8857,
Fax: +44-020-7-862-8820
chri@sas.ac.uk

সিএইচআরআই আফ্রিকা,
আক্রা কার্যালয়
House No.9, Samora Machel
Street Asylum Down
opposite Beverly Hills Hotel
Near Trust Towers, Accra, Ghana
Tel/Fax: +00233-21-271170
chriafr@africaonline.com.gh

www.humanrightsinitiative.org

পুলিশ সম্পর্কে ১০১ প্রশ্নোত্তর

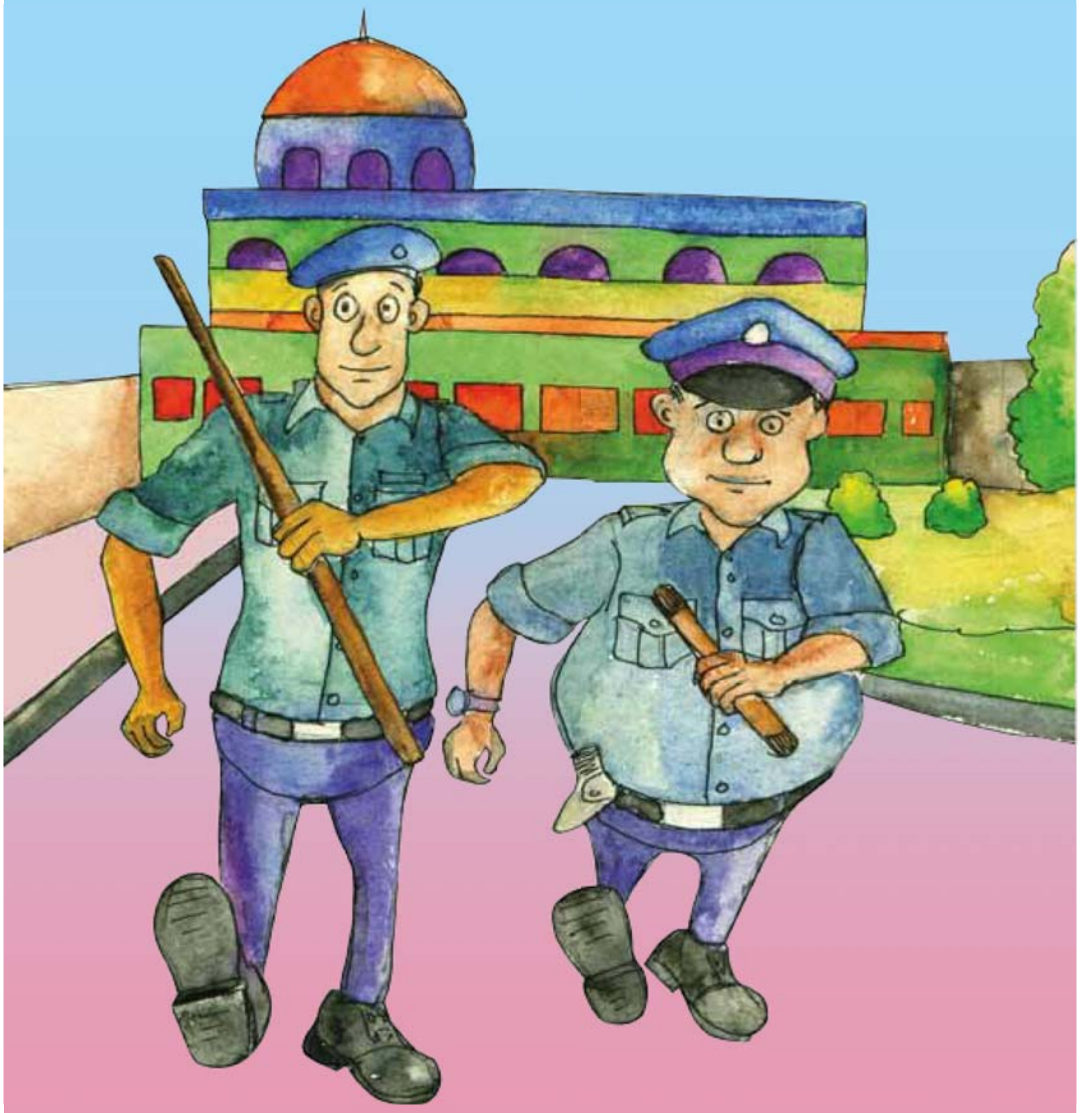

অনুবাদ ও প্রাসঙ্গিককরণ : এড. তাজুল ইসলাম ও মাজহারুল ইসলাম

অঙ্কন: রাজীব বাঙাল ও সৌরি ছোঁয়া

প্রকাশক: নাগরিক উদ্যোগ, ব্লাস্ট ও কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ

২য় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০১৪

ISBN: 978-984-33-1980-7

দাম: ১০০ টাকা

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই), দিল্লি থেকে প্রকাশিত মায়া দারুওয়ালা ও নাভাজ কোটওয়াল লিখিত 101 Things You Wanted To Know About The Police But Were Too Afraid To Ask পুস্তিকা অবলম্বনে বাংলাদেশ সংস্করণ করা হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ তথ্যই বাংলাদেশের আইন ও বাস্তবতার নিরিখে পুনলিখিত হয়েছে।

ভূমিকা

প্রতিনিয়ত আমরা কোন না কোনভাবে পুলিশের মুখোমুখি হই। আমরা পুলিশকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে দেখি; যেমন- যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ, ভিআইপিদের নিরাপত্তা, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ, জনগণকে নিরাপত্তা দিয়ে আদালতে নেওয়া, আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, থানায় অভিযোগ দায়ের বা অপরাধী ও জঙ্গিদের গ্রেফতার ইত্যাদি। আমরা পুলিশ সম্পর্কে পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন ও জনসাধারণের কাছ থেকে প্রচুর শুনতে পাই। প্রত্যেকেরই পুলিশ সম্পর্কে একটা মতামত থাকে। কিন্তু বাস্তবে, অধিকাংশ মানুষই তাদের সম্পর্কে খুব কম জানে।

গণতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিনিধি হয়ে ইউনিফর্ম পরে জনগণকে দমন করা বা নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার জন্য পুলিশ নয়। বরং পুলিশ বিভাগ জনসাধারণের জন্য একটি অপরিহার্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, যার দায়িত্ব হচ্ছে আইনানুযায়ী জনসাধারণকে রক্ষা করা এবং নিরাপদে রাখা। আমলাদের মত পুলিশও সরকারি কর্মচারী। যাদেরকে জনগণের টাকায় জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়।

যেহেতু জনগণের প্রতি পুলিশের দায়িত্ব রয়েছে, জনগণেরও পুলিশের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তাদেরকে ভয় ও অপছন্দ করা অথবা শুধুমাত্র সমস্যায় পড়ে তাদের কাছে যাওয়া যথেষ্ট নয়। আইনকে সমুন্নত রাখতে জনগণ এবং পুলিশকে একসাথে একযোগে কাজ করতে হবে। তাদের কাজ ও কাজের প্রতিবন্ধকতা; তারা কী করে এবং কিভাবে তা করে; তাদের সংস্থা কেমন এবং সর্বোপরি তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্বের সীমারেখা বুঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে, জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানাও অত্যন্ত জরুরি যাতে করে পুলিশ বা জনসাধারণ কেউই আইন ভঙ্গ করতে না পারে কিংবা অন্যায় করে পার পেয়ে যেতে না পারে। এটাকেই আইনের শাসন বুঝায়।

এই পুস্তিকাটি পুলিশকে জানার একটি সহজ নির্দেশিকা। সাধারণত যখন আমরা কোন বিষয়ে জানি তখন তা বলিষ্ঠভাবে বলতে পারি এবং যখনই আমরা নির্ভয়ে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলি তখন তার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। পুস্তিকাটি এই প্রত্যাশায় প্রকাশ করা হলো যে, পুলিশ ও জনগণের অধিকার সম্পর্কে জেনে, প্রত্যাশিত উন্নত পুলিশি সেবার লক্ষ্যে তাদের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাবে।

১. আমাদের কেন পুলিশ বাহিনী রয়েছে?

নাগরিকের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করা পুলিশ বাহিনীর কর্তব্য। পুলিশ সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং অপরাধ চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করে। আইন প্রয়োগকারী বাহিনী হিসেবে পুলিশ বাহিনীসহ সবাই যাতে সকল ক্ষেত্রে ও সকল পদক্ষেপে আইন অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করে।

২. পুলিশের কী কী দায়িত্ব রয়েছে?

অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং যখনই অপরাধ সংঘটিত হয় তৎক্ষণাৎ তা যথাযথভাবে সনাক্ত ও তদন্ত করা পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব। আদালতে উপস্থাপন করতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জন্য প্রকৃত ও সাক্ষ্য নির্ভর মামলা প্রস্তুত করা, সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং চারপাশে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা পুলিশের দায়িত্ব। দাঙ্গা দমন, শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী যেকোন কাজ প্রতিরোধ এবং মালিকানাবিহীন হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি আয়ত্বে নেওয়া প্রভৃতিও পুলিশের দায়িত্ব।

হাতেনাতে গ্রেফতার

৩. পুলিশের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?

পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা রয়েছে। এ সকল ক্ষমতা আইনের দ্বারা অর্পিত এবং পুলিশ কেবলমাত্র আইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী তা প্রয়োগ করতে পারে। ফলে তারা গ্রেফতার, তল্লাশি ও আলামত জব্দ করতে পারে; অপরাধের তদন্ত করতে পারে; সাক্ষীদের প্রশ্ন করতে পারে এবং সন্দেহভাজন কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা এবং সর্বপরি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা পুলিশের অন্যতম কাজ। তবে তাদের এসব কিছু করতে হবে আইন অনুযায়ী- আইনের বাইরে অন্য কোনভাবেই নয়। তারা যা খুশি তা করতে পারে না। ক্ষমতার যেকোন অপব্যবহার বা দায়িত্বে অবহেলা শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দেওয়ানি আইনে যা অন্যায়/অনুচিত কাজ ও তা ফৌজদারি আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এ জন্য পুলিশকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়।

তদন্ত

৪. আমাদের দেশে কত ধরনের পুলিশ ফোর্স রয়েছে?

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের পুলিশ ফোর্স রয়েছে; যাদের কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, সাধারণ পুলিশ ফোর্স, ব্যাটালিয়ন পুলিশ ফোর্স যেমন:- আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রোটেকশন ব্যাটালিয়ন ও র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন; ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ফোর্স, ট্যুরিস্ট পুলিশ ফোর্স, হাইওয়ে পুলিশ ফোর্স, নৌ পুলিশ ফোর্স, রেলওয়ে পুলিশ ফোর্স ইত্যাদি। এছাড়া গোয়েন্দা সংস্থা যেমন: ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি), ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) ইত্যাদি পুলিশ ফোর্স রয়েছে। এ সকল ফোর্স কেন্দ্রীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৫. প্যারামিলিটারি ফোর্স বলতে কী বুঝায়?

সেনাবাহিনীর সমান্তরালে গঠিত ও পরিচালিত কোন ফোর্সকে প্যারামিলিটারি বলা হয়ে থাকে। সরকারের নির্দেশে এরা দেশে যেকোন ধরনের জন-অসন্তোষ, গোলযোগ, বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি দমনে বেসামরিক প্রশাসন/ পুলিশকে সহায়তা করে থাকে। যেমন- বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড; যারা সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৬. যে কেউ কি পুলিশে যোগ দিতে পারে?

হ্যাঁ। যে কোন ব্যক্তি পুলিশে যোগ দিতে পারে। তবে তাকে পুলিশের নির্দিষ্ট পদে চাকুরির প্রয়োজনীয় শর্ত এবং যোগ্যতা পূরণ করতে হয়। যেমন কনস্টেবল হতে হলে কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। সাব-ইন্সপেক্টর হতে হলে কমপক্ষে স্নাতক পাশ হতে হবে। শারীরিক গঠন যেমন- উচ্চতা, বুকের মাপ, ওজন এবং বয়সসহ এইরূপ আরো কিছু শর্ত রয়েছে।

৭. কীভাবে একজন পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিতে পারে?

বাংলাদেশে তিন স্তরে পুলিশে লোক নিয়োগ করা হয়- কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টর অথবা ট্রাফিক সার্জেন্ট এবং অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (এএসপি)। কনস্টেবল ও সাব-ইন্সপেক্টর অথবা ট্রাফিক সার্জেন্ট হতে হলে প্রথমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিতে হয়। এ পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় উচ্চতা, বুকের মাপ এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের গঠন পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় পাশ করলে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পর মৌখিক পরীক্ষা এবং সবশেষে চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। এখানে দেখা হয় প্রার্থী পুলিশের কাজ করার জন্য স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত কি না এবং এরপরই চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়া হয়। কনস্টেবলগণ পদোন্নতি পেয়ে সাব-ইন্সপেক্টর এবং সাব-ইন্সপেক্টরগণ পদোন্নতি পেয়ে এএসপি হতে পারে। এএসপি পদে বিসিএস বা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়।

৮. বিসিএস (পুলিশ) কী?

বিসিএস অর্থ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস। পুলিশ বাহিনীতে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদায় যোগদান করতে হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে উত্তীর্ণ হতে হয়। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তারা এএসপি পদমর্যাদায় যোগদান করে।

৯. কীভাবে এএসপি হওয়া যায়?

এএসপি হতে হলে প্রথমত কমপক্ষে স্নাতক পাশ হতে হবে এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন ফরম, পদের সংখ্যা, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়। বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস যেমন- প্রশাসন, পররাষ্ট্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বাস্থ্য, পুলিশ, শিক্ষা ইত্যাদি ক্যাডারের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়। সরকারি কর্ম কমিশনের নির্ধারিত প্রিলিমিনারি, লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। মৌখিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হয় এবং প্রার্থীদের বিভিন্ন ক্যাডারের জন্য মনোনীত করা হয়। পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় নম্বর পেলে পুলিশ ক্যাডারে নির্বাচিত হওয়া যায়। পুলিশ ক্যাডারে এএসএপি হিসেবে প্রাথমিকভাবে মনোনীত হওয়ার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকার গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে একজন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে এএসপি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

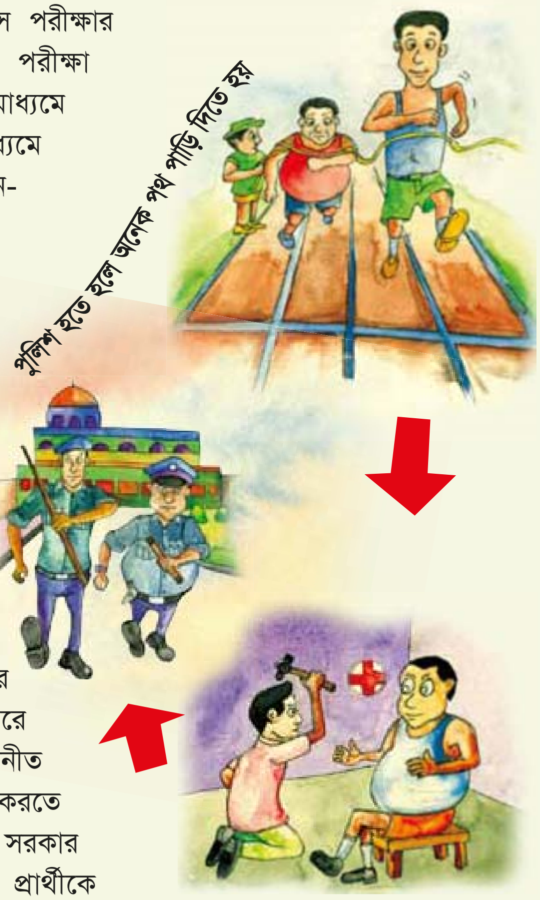

১০. একজন এএসপি কী ধরনের প্রশিক্ষণ পায়?

এএসপি পদে নিয়োগ পাওয়ার পর তাকে রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমিতে এক বছরের প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। ঐ প্রশিক্ষণ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হওয়ার পর তাকে বিভিন্ন থানা, সার্কেল অফিস, আদালত প্রভৃতি জায়গায় মোট ছয় মাস ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ শেষে নিয়মিত পোস্টিং দেয়া হয়। পরবর্তী কালে চাকুরি স্থায়ীকরণের পূর্বে তাকে সাভারের পিএটিসিতে চারমাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কোন বিশেষ ফোর্সে নিয়োগ দেয়া হলে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণও দেয়া হয়।

১১. অন্যান্য পদের পুলিশগণ কী ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে?

সাব-ইন্সপেক্টর অথবা ট্রাফিক সার্জেন্টদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সারদা পুলিশ একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়, অপরদিকে অন্যান্য নন-অফিসার পুলিশদের প্রশিক্ষণ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সময়ে তাদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ ছাড়াও শারীরিক, অস্ত্র চালনা, প্রাথমিক চিকিৎসা, দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া, তাদেরকে শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন আইন, আইনের প্রয়োগ, তদন্তের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, জনতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং চাকুরি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১২. আমাদের দেশে কতগুলো থানা রয়েছে?

বর্তমানে আমাদের দেশে ৯৯৫টি থানা রয়েছে।

১৩. আমাদের কি পর্যাপ্ত পুলিশ আছে?

না। জাতিসংঘের মানদন্ড অনুযায়ী প্রতি ১ লাখ মানুষের জন্য কমপক্ষে ২৩০ জন পুলিশ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতি ১ লাখ মানুষের জন্য মাত্র ৮৮ জন পুলিশ রয়েছে অর্থাৎ প্রতি ১১৩৩ জনের জন্য মাত্র ১ জন পুলিশ। আমাদের মোট পুলিশের সংখ্যা ১ লাখ ৫২ হাজারের মত। তবে ছোট শহর বা গ্রামের তুলনায় বড় শহরে বেশি পুলিশ সদস্য কাজ করে। ফলে গ্রামে বা ছোট শহরে এই ঘাটতি অনেক বেশি। আবার কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য বিপুল পরিমাণ পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। অন্যদিকে, প্রশাসনিক ও ট্রাফিক ডিউটির জন্যও প্রচুর পুলিশ সদস্যকে নিয়োজিত থাকতে হয়। ফলে অপরাধ দমন, তা চিহ্নিতকরণ ও সামগ্রিকভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ পাওয়া যায় না।

১৪. পুলিশ ফোর্সে কি নারী সদস্য রয়েছে? নারী পুলিশ কি ভিন্ন রকম দায়িত্ব পালন করে?

হ্যাঁ। কিন্তু তাদের সংখ্যা মোট পুলিশ ফোর্সের মধ্যে শতকরা মাত্র ১.৮ ভাগ। এ পর্যন্ত যে আইন ও নীতিমালা রয়েছে তাতে নারী পুলিশ সদস্যরা পুরুষ সদস্যদের মতো একই দায়িত্ব পালন করে।

পুলিশ ফোর্সে নারীর সংখ্যা একেবারেই কম

১৫. পুলিশ ফোর্সে কি বিশেষ সংরক্ষণ বা কোটা আছে?

হ্যাঁ। বাংলাদেশের সরকারি চাকুরিতে যে কোটা পদ্ধতি রয়েছে তা পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন, জেলা কোটা, নারী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের কোটা ইত্যাদি।

১৬. পুলিশ ফোর্সে কেন নারী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্যদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন?

পুলিশ ফোর্সে নারী-পুরুষ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, শ্রেণী, জাতি, বর্ণ ও গোত্রের সংমিশ্রণ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিভিন্ন গোষ্টির আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা কুসংস্কার ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি দূরীকরণে খুবই সহায়ক।

আইজি

১৭. কীভাবে একজন পুলিশকে চেনা যায়?

পুলিশ সদস্যদের আলাদা পোশাক রয়েছে। এ পোশাকের জন্য অন্যদের থেকে পুলিশকে আলাদা করে চেনা যায়। যেমন মেট্রোপলিটন পুলিশ, থানা পুলিশ ও অন্যান্য পুলিশের নিজ নিজ রঙের পোশাক, কোমরে বেল্ট, এবং কাঁধে ব্যাজ থাকে যেটা তাদের পদমর্যাদা এবং কোন ফোর্সের অন্তর্ভূক্ত তা নির্দেশ করে। পুলিশ সদস্যদের বুকে নাম সম্বলিত একটি ছোট ফলকও যুক্ত থাকে।

এডিশনাল আইজি

১৮. পুলিশের মধ্যে বিভিন্ন পদগুলো কী কী?

পুলিশ সদস্যদের বিভিন্ন পদমর্যাদায় কনস্টেবল হলো সবচেয়ে নিচের ধাপ। অন্য পদগুলো হলো নায়েক, হেড কনস্টেবল (ঐঈ), অ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর (অঝও), সাব-ইন্সপেক্টর (ঝও), আর্মড সাব-ইন্সপেক্টর, টাউন সাব- ইন্সপেক্টর, আর্মড ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর, অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (অঝচ), অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার অব পুলিশ, সিনিয়র অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ঝৎ. অঝচ), এডিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (অফফষ. ঝচ), সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ঝচ), এডিশনাল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (অফফষ. উওএ), পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (উওএ), এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (অফফষ. ওএ), ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ওএচ)।

ডিআইজি

এডিশনাল ডিআইজি

পদোন্নতির ক্ষেত্রে কনস্টেবল থেকে পরীক্ষা দিয়ে অ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর (ASI) ⟶ সাব ইন্সপেক্টর (SI) ⟶ ইন্সপেক্টর ⟶ অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ASP) ⟶ সিনিয়র অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (Sr. ASP) ⟶ এডিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ⟶ (Addl. SP) সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (SP) ⟶ এডিশনাল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (Addl. DIG) ⟶ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (DIG) এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (Addl. IG) ⟶ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (IGP)।

পদোন্নতির অন্য নিয়ম হচ্ছে কনস্টেবল ⟶ নায়েক ⟶ হেড কনস্টেবল আর্মড সাব-ইন্সপেক্টর ⟶ আর্মড ইন্সপেক্টর ⟶ অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ⟶ পূর্ববৎ।

পদোন্নতির আরেকটি নিয়ম হচ্ছে, কনস্টেবল থেকে পরীক্ষা দিয়ে সরাসরি হেড কনস্টেবল ⟶ টাউন সাব-ইন্সপেক্টর ⟶ ইন্সপেক্টর ⟶ অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ⟶ পূর্ববৎ।

১৯. টহল পুলিশ বলতে কী বুঝায়?

টহল পুলিশ হলো থানার বাইরে কোন নির্দিষ্ট স্থানে, বিশেষ প্রয়োজনে কর্তব্যরত পুলিশ। তাদের টহল পুলিশ বলা হয় এ কারণে যে, কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা রুটে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না অথবা সন্দেহজনক কিছু ঘটছে কি না তা পরীক্ষা করতে তারা নিয়মিত টহল দেয়।

২০. পদমর্যাদা সাপেক্ষে সকল পুলিশ সদস্য কি একই ধরনের দায়িত্ব পালন করে?

না। কনস্টেবল থেকে শুরু করে আইজিপি পর্যন্ত প্রত্যেক পুলিশ সদস্যের দায়িত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে। তাদের দায়িত্বাবলী পুলিশ ম্যানুয়ালে উল্লেখ আছে। সিনিয়র অফিসারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব একজন জুনিয়র অফিসার পালন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন এসআই একজন এসপির ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে না। কিন্তু প্রয়োজনে একজন নিম্ন পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব একজন উচ্চ পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার পালন করতে পারে।

২১. ট্রাফিক পুলিশ কি ট্রাফিক সংক্রান্ত অপরাধ ব্যতীত অন্য অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে?

হ্যাঁ। ট্রাফিক পুলিশও পুলিশ বাহিনীর সদস্য, যাকে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সে যদি অপরাধ সংঘটিত হতে দেখে তাহলে অন্যান্য পুলিশের মতো সেও অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারে।

২২. সিআইডি কী? সিআইডি কি পুলিশ থেকে আলাদা?

সিআইডি অর্থ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট বা ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ। এটি পুলিশের একটি তদন্ত সংস্থা। গুরুতর অপরাধ যেমন- আলোচিত হত্যাকান্ড, রাষ্ট্রদ্রোহীতা, জালিয়াতি, প্রতারণা, এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে এমন অপরাধ তদন্তে এদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

সিআইডি পুলিশ থেকে আলাদা নয়। সিআইডি সদস্যদের পুলিশ সদস্যদের মধ্যে থেকেই বেছে নেয়া হয়।

২৩. কমিউনিটি পুলিশিং কী?

এটি সাধারণ পুলিশের কোন অংশ নয়। কমিউনিটি পুলিশিং অর্থ কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত পুলিশি ব্যবস্থা। অন্যভাবে বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় অপরাধ দমন ও অপরাধ উদ্‌ঘাটন, অপরাধীদের গ্রেফতার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পুলিশ ও ঐ এলাকার জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমস্যা ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে জনসচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্‌ঘাটন ও বাস্তবায়নের পদ্ধতিই কমিউনিটি পুলিশিং।

২৪. “ক্রসফায়ার” কী? আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক তথাকথিত “ক্রসফায়ার” বৈধ বা সমর্থনযোগ্য কিনা?

শাব্দিক অর্থে ক্রসফায়ার হচ্ছে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে সরাসরি গোলাগুলিরত অবস্থায় যে স্থানে দুই বা ততোধিক দিক থেকে গুলি অতিক্রম করে।

ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার যেকোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। কোন ব্যক্তি অন্যায় করলে আইন অনুযায়ী তার নিরপেক্ষ বিচার হবে এবং উক্ত বিচারে যে শাস্তি হবে তা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু “ক্রসফায়ারের” নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

২৫. র‍্যাব কী? র‍্যাব কি সকল অপরাধের তদন্ত করতে পারে?

র‍্যাব আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৯ এর অধীনে গঠিত একটি বিশেষ ফোর্স। সন্ত্রাস দমন ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের লক্ষ্য ঘোষণা দিয়ে ২০০৪ সালের ২৬ মার্চ র‍্যাব গঠিত হয়। এই বিশেষ ফোর্স বাংলাদেশের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত।

র‍্যাবের মূল কাজ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা; অপরাধ সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি; অবৈধ অস্ত্র-গোলাবারুদ, বিস্ফোরক ও এই ধরনের ক্ষতিকারক দ্রব্য উদ্ধার করা; অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা; সরকারি আদেশ অনুসারে যেকোন অপরাধের তদন্ত করা এবং অন্যান্য যে কোন সরকারি দায়িত্ব পালন করা। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালে উদ্ধৃত আইনটি সংশোধন করে র‍্যাব গঠনের আইনি বিধান সন্নিবেশিত করা হয়।

২৬. পুলিশ ফোর্সের দায়িত্বে কে থাকেন? পুলিশ প্রধানকে কেন মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করতে হয়?

রাষ্ট্রের সমগ্র পুলিশ ফোর্সের জন্য একজন প্রধান ব্যক্তি থাকেন। তাকে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ বা সংক্ষেপে আইজিপি বলা হয়। তিনিই সর্বোচ্চ ব্যক্তি। কিন্তু তাকেও সরকারের কাছে রিপোর্ট করতে হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণের কাছে জবাবদিহিতার ধারণা থেকেই এটা করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো দেশের প্রত্যেক নাগরিক যাতে নিরাপদ বোধ করে এবং নিজের জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কে উদ্বেগমুক্ত থাকে। সরকার এই দায়িত্ব পুলিশের কাছে অর্পণ করেছে। পুলিশ তার দায়িত্ব কতটুকু পালন করছে তা সরকারকে জানানোর প্রয়োজনেই এই রূপ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রয়েছে।

সরকারের দায়িত্ব হলো এটা নিশ্চিত করা যে, পুলিশ সৎ, নিরপেক্ষ ও দক্ষতার সাথে আইন অনুসারে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। আইনের বাইরে পুলিশ যা খুশি তা করতে পারে না।

২৭. পুলিশ বাহিনী পরিচালনার অর্থ কোথা থেকে আসে?

রাষ্ট্রের করদাতারা অর্থাৎ জনগণই সেবা পাওয়ার জন্য পুলিশের অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। প্রতিটি দেশেরই একটি বাজেট আছে যেখানে পুলিশ সার্ভিসের জন্য বরাদ্দ থাকে। পুলিশ এই বরাদ্দ থেকে অর্থ পেয়ে থাকে যার থেকে তাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

২৮. পুলিশের জন্য বাজেট কে অনুমোদন করে এবং এর সবচেয়ে বড় অংশ কোন খাতে খরচ হয়?

রাষ্ট্রের আইন প্রণেতারা অর্থাৎ জাতীয় সংসদ জাতীয় বাজেট পাসের সময় পুলিশের জন্যও বাজেট অনুমোদন করে থাকে। পুলিশের প্রশাসন শাখা খসড়া বাজেট তৈরি করে। এই খসড়া বাজেট আইজিপির মাধ্যমে অনুমোদিত হয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসে। তারপর অর্থ মন্ত্রণালয় এটা অনুমোদন করে রাষ্ট্রীয় বাজেটের অংশ হিসেবে অনুমোদনের জন্য সংসদে পেশ করে। তারপর এটা সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপন করা হয়। সংসদে আলোচনার পর পুলিশের জন্য বাজেট চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

পুলিশের জন্য বাজেটের একটি বড় অংশ তাদের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হয়ে থাকে। খরচের অন্যান্য খাতগুলো হল প্রশিক্ষণ, তদন্ত, অবকাঠামো, আবাসন ইত্যাদি।

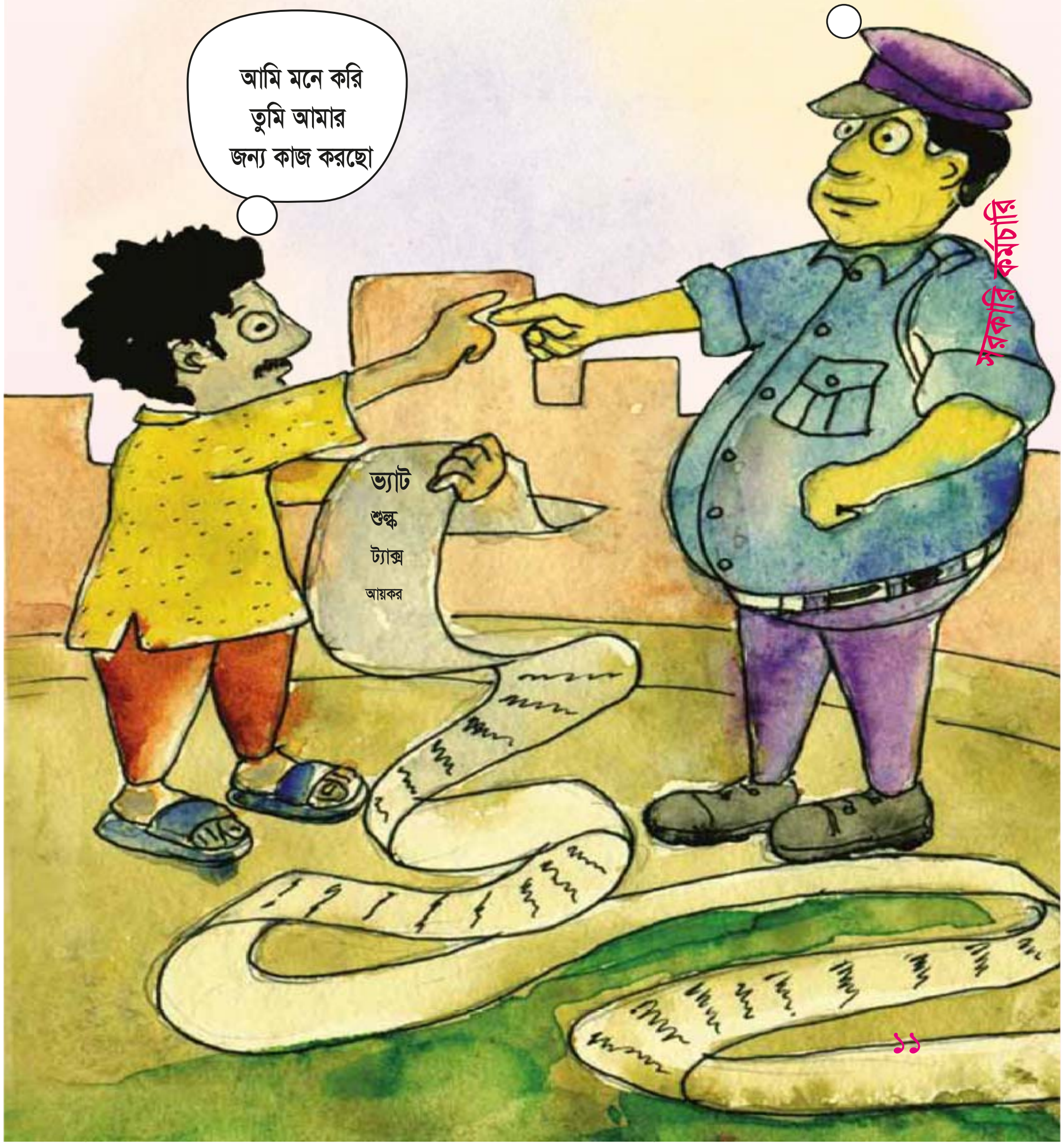

২৯. পুলিশের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে খরচ করা হয়েছে কি না তা জনগণ জানবে কিভাবে?

সরকারের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) অফিস প্রতি বছর পুলিশের ব্যয়িত অর্থ ও হিসাবের নিরীক্ষণ (Audit) করে থাকে। এই নিরীক্ষিত হিসাব জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। নিরীক্ষণ শেষে অডিট রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে এবং জাতীয় সংসদের লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করা হয়। তথ্য অধিকার আইনের আওতায়ও যেকোন ব্যক্তি পুলিশের বাজেট ও ব্যয় সম্পর্কে জানতে পারে। যেহেতু জনগণের করের টাকায় পুলিশ পরিচালিত হয়, কাজেই এই টাকা যাতে যথাযথভাবে খরচ করা হয় তা নিশ্চিত করতে যেকোন নাগরিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে পারে। গণমাধ্যমও এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে।

৩০. কোন কোন আইন দ্বারা পুলিশ পরিচালিত হয়?

সাধারণভাবে ১৮৬১ সালের পুলিশ অ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল (পিআরবি), বিভিন্ন মহানগরীর জন্য মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ ইত্যাদি দ্বারা পুলিশ পরিচালিত হয়। এছাড়াও ফৌজদারি কার্যবিধি এবং আরো কিছু আইন রয়েছে যেগুলোতে পুলিশ কিভাবে কাজ করবে তার নির্দেশনা রয়েছে।

৩১. ফৌজদারি কার্যবিধি কী? দন্ডবিধি কী?

একটি অপরাধ সংঘটিত হবার পর মামলা দায়ের, তদন্ত ও বিচারের বিস্তারিত পদ্ধতিগত আইন ফৌজদারি কার্যবিধিতে বর্ণিত রয়েছে।

অন্যদিকে, মানুষের সমস্ত কর্ম বা আচরণ আইন সমর্থন করে না। মানুষের যে আচরণ বা কাজ দ্বারা অন্যের ক্ষতি সাধিত হয় সেগুলো অপরাধ। মানুষের এরূপ কোন কোন কাজ অপরাধের পর্যায়ে পড়ে এবং সে অপরাধ সংঘটিত করার কারণে তাকে কী ধরনের শাস্তি পেতে হয় তা বিস্তারিত বিবরণ দন্ডবিধিতে রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, বিভিন্ন অপরাধের সংজ্ঞা ও শাস্তির পরিমাণ সম্বলিত আইনই হচ্ছে দন্ডবিধি।

৩৩. বেআইনি সমাবেশ, সড়ক অবরোধ, গণ উপদ্রব ইত্যাদি অপরাধ পুলিশ আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে কেন?

প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে রাস্তাঘাট এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জায়গা পরিস্কার, ভীড়মুক্ত, নিরাপদ, যথোপযুক্ত ও রোগ-জীবাণু মুক্ত রাখে তার জন্য কিছু অপরাধের বিষয় পুলিশ আইনে বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, রাস্তা জুড়ে যত্রতত্রভাবে গবাদি পশু চারণ, পশু জবাই বা পশুর প্রতি নির্দয় আচরণের জন্য যেকোন ব্যক্তিকে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে আটক করতে পারে। যারা রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে, রাস্তা অপরিচ্ছন্ন করে, অনুমোদন ছাড়াই বিক্রির উদ্দেশ্যে রাস্তায় পণ্য জড়ো করে কিংবা মাতলামি অথবা দাঙ্গা সৃষ্টি করে ইত্যাদি ধরনের অসঙ্গত বিষয়ে জড়িত যেকোন ব্যক্তিকে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে আটক করতে পারে।

৩৪. আইনের শাসনের অর্থ কী?

আইনের শাসনের অর্থ হলো, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে আইন মেনে চলা এবং সংবিধানের অধীনে দেশে যেসব আইন রয়েছে, সে অনুসারে জীবনযাপন করা। কোন ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এমন কি আইন প্রয়োগকারী হিসেবে পুলিশের প্রত্যেক কাজই আইন অনুযায়ী হতে হবে এবং যদি তা না হয় তবে তাকেও আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত, যথোপযুক্ত এবং তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা অবলম্বন করতে হবে।

৩৫. যদি কোন পুলিশ অন্যায় করে তাহলে কি সে শাস্তি পাবে?

হ্যাঁ। যদি কোন পুলিশ আইন ভঙ্গ করে তাহলে অন্য যেকোন ব্যক্তির মত সেও শাস্তি পাবে। বাস্তবিকপক্ষে, যেহেতু এই ধরনের ব্যক্তির উপর আইন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্তায়, সেহেতু যেকোন ধরনের আইন ভঙ্গের কারণে তার অধিকতর শাস্তি হওয়া উচিত।

৩৬. একজন পুলিশ কিভাবে শাস্তি পেতে পারে?

অন্যায় করার অপরাধে একজন পুলিশ বিভিন্নভাবে শাস্তি পেতে পারে। যদি সে কোন অন্যায় করে থাকে তাহলে তাকে একজন সাধারণ মানুষের মতোই আইনের আওতায় এনে বিচার করা হয়। যদি সে রূঢ় আচরণ, খারাপ ব্যবহার অথবা যা তার করা উচিত ছিল -তা না করে থাকে অথবা অন্য কোন ধরনের পেশাগত অসদাচরণ করে থাকে তাহলে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাকে সতর্ক করে দিতে পারে কিংবা তার বেতন কর্তন, পদাবনয়ন, পদোন্নতি স্থগিত, বদলি এমনকি চাকুরিচ্যুতির মাধ্যমে তাকে শাস্তি দিতে পারে।

৩৭. পুলিশ সদস্যরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। এই ঝুঁকির ক্ষেত্রে তারা কি বীমাকৃত?

না। পুলিশ সদস্যরা বীমাকৃত নয়। কিন্তু তাদের চাকুরি ঝুঁকির ক্ষেত্রে বীমা থাকা প্রয়োজন। তবে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে পুলিশ কল্যাণ তহবিলের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। এটা তাদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয়। কোন পুলিশ সদস্য প্রয়োজনে এই কল্যাণ তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য নিতে পারে। পুলিশ সদস্যগণ বিপদজনক পরিবেশে কাজ করে। এর মধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে বা আহত হয়। কর্তব্যরত অবস্থায় যারা মারা যায় তাদের মধ্যে বেশির ভাগই কনস্টেবল। এক্ষেত্রে কখনো কখনো সরকার থেকে তাদের অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের অনুদান প্রদান করা হয়।

৩৮. একজন পুলিশ কি তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা মন্ত্রীর মত আদেশ প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তির যেকোন ধরনের আদেশ পালন করতে বাধ্য?

না। শুধুমাত্র আইনানুগ ব্যক্তি কর্তৃক বৈধ আদেশই একজন পুলিশের জন্য অবশ্য পালনীয়। সে তার কৃত যেকোন ধরনের অন্যায় এমনকি ঐ ধরনের কাজ করার জন্য উর্ধ্বতন বা যেকোন কর্তৃপক্ষের আদেশ থাকলেও তার জন্য দায়ী থাকবে। যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে অন্যায় এবং বে-আইনি কাজটি করতে বলেছিল-এ ধরনের কোন যুক্তি সে দেখাতে পারবে না।

৩৯. একজন পুলিশ কি সব সময় দায়িত্বরত থাকে?

হ্যাঁ। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন এটা নিশ্চিত করেছে যে, 'একজন পুলিশ সব সময়ের জন্য দায়িত্বরত রয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে'। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সে কখনও বিশ্রাম নিতে পারবে না। এর অর্থ একজন পুলিশ পোশাক পরিহিত অবস্থায় থাকুক বা না থাকুক কিংবা যেখানেই থাকুক সে অবশ্যই জরুরি ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে দায়িত্ব পালন করবে এবং কর্তৃপক্ষের ডাকে বা নির্দেশে সাড়া দিবে।

৪০. কেউ কি তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সহায়তা নিতে পারে?

হ্যাঁ। যদি কারো ওপর মারাত্মক হুমকি থাকে তবে সে অবশ্যই পুলিশের সহায়তা নিতে পারে। রাষ্ট্র কখনও কখনও এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। আবার কখনও কখনও বিশেষ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিনিময়ে গ্রহীতাকে অর্থ প্রদান করতে হয়। পুলিশ আইন অনুযায়ী যদি কারও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়নের প্রয়োজন হয় এবং কর্তৃপক্ষ এতে সম্মতি জ্ঞাপন করে তবে উক্ত সময়ে পুলিশ মোতায়নের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একটি বিয়ের বড় অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অর্থ প্রদান সাপেক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা যেতে পারে। আবার কোন জায়গা যদি অপরাধপ্রবণ বা কোন জনসমাবেশ থাকে বা কোন বিশেষ কর্মসূচি থাকে, সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন পুলিশ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বেরই অংশ এবং সেক্ষেত্রে তার জন্য কোন অর্থ প্রদান করতে হয় না।

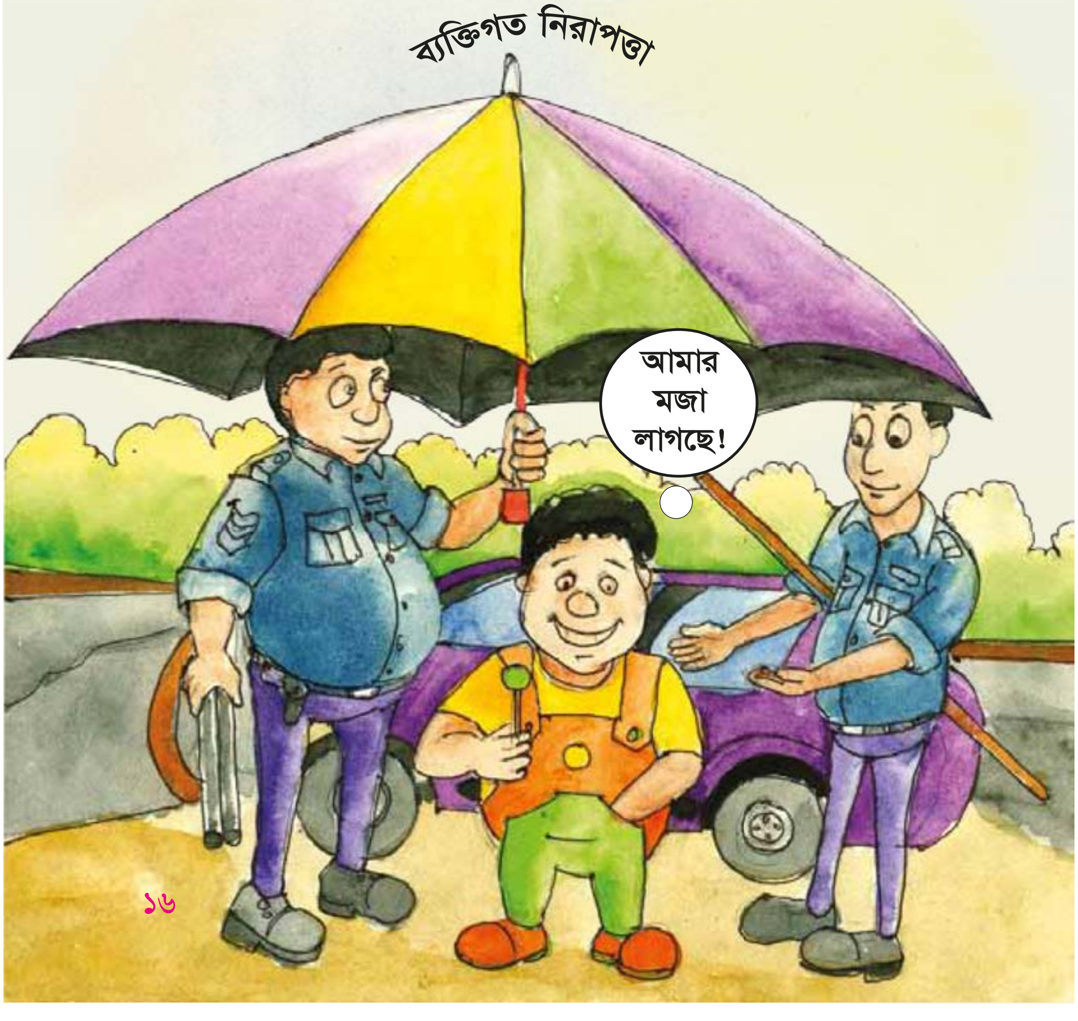

৪১. পুলিশ কি গণপরিবহণে ইচ্ছামত বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ কিংবা বাজার থেকে অর্থ প্রদান না করেই পণ্য গ্রহণ করতে পারে?

কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কর্তব্যরত অবস্থায় সরকারি যানবহন ব্যবহারের জন্য পুলিশকে পাশ প্রদান করা হয়। এছাড়া, কোন পুলিশ বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের সুবিধা পায় না। ঠিক তেমনিভাবে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেও কোন পুলিশ কোন দোকান থেকে শুধুমাত্র পুলিশ হওয়ার কারণে বিনামূল্যে পণ্য গ্রহণ করতে পারে না। সকল নাগরিকের মত তাকেও পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান করতে হয়।

৪২. পুলিশের সকল নির্দেশই কি কেউ পালন করতে বাধ্য? যদি কোন পুলিশ তার সাথে কাউকে কোথাও যেতে বলে তাহলে কি সেখানে যেতে হবে?

পুলিশের আইনানুগ নির্দেশ পালন এবং একজন পুলিশের দায়িত্ব পালনে তাকে সহায়তা করা সকলেরই কর্তব্য। বিশেষত যদি পুলিশ কোন মারামারি বন্ধের চেষ্টা করে, কোন অপরাধ প্রতিরোধের চেষ্টা করে বা তার হেফাজত থেকে পলায়নপর কাউকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, তখন পুলিশের নির্দেশ পালন ও তাকে সহায়তা করা সকলের উচিত। আবার, যদি কারও কাছে অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য থাকে তবে পুলিশকে সেই তথ্য প্রদান করা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আইন লঙ্ঘনকারীকে আশ্রয় প্রদান না করাও সকলের দায়িত্ব। যদি কেউ কোন ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানে বা দেখে তবে সে সম্পর্কে আদালতে সাক্ষ্য দেয়া তার দায়িত্ব।

যদি কোন পুলিশ তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে কোন ব্যক্তিকে আটক, অস্ত্র উদ্ধার, সম্পত্তি জব্দ বা অপরাধের বিষয়ে সাক্ষী হওয়া, সনাক্তকরণ, জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর ইত্যাদির জন্য কাউকে তার সাথে যেতে বলে, তবে অবশ্যই তার সাথে যেতে হবে এবং তাকে সহায়তা করতে হবে।

৪৩. যদি কোন পুলিশ কাউকে থানায় আসতে বলে তখন তার কি যাওয়া উচিত?

কোন পুলিশ যদি কাউকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চায় বা কোন অপরাধের তদন্ত করতে চায় সেক্ষেত্রে পুলিশকে সমন জারি করতে হবে। এটা না করা পর্যন্ত পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না। যেক্ষেত্রে কোন নারী বা শিশু জড়িত সেক্ষেত্রে পুলিশ শুধু তাদের বাসায় গিয়ে শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

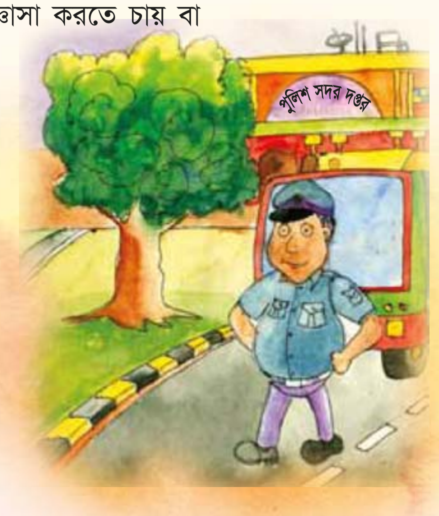

৪৪. পুলিশ যে সকল প্রশ্ন করবে তার সবগুলোর উত্তর কি দিতে হবে?

যদি কেউ কোন ঘটনা সম্পর্কে কোন কিছু জেনে থাকে তাহলে সততার সাথে খোলামেলাভাবে পুলিশকে সব তথ্য প্রদান করা উচিত। আর যদি সে কিছু না জেনে থাকে, তবে পুলিশ তাকে কোন বিবৃতি প্রদান বা শেখানো কিছু বলার জন্য বাধ্য করতে পারে না। যখন পুলিশ কাউকে প্রশ্ন করবে তখন তার সাথে একজনের উপস্থিতি কাম্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নিজের বিরুদ্ধে যায় এমন কোন কথা বলতে বা সাক্ষ্য দিতে কেউ বাধ্য নয়।

৪৫. যখন কেউ বিপদাপন্ন, তখন কি পুলিশ তাকে সাহায্য করবে?

হ্যাঁ অবশ্যই। আইন অনুযায়ী সকলের নিরাপত্তা প্রদান করা পুলিশের সাধারণ দায়িত্ব। পুলিশ আন্তরিকভাবে জনসাধারণের ভাল করার মানসিকতা, সহানুভূতি ও সুবিবেচনার মানসিকতা থেকে সেবা প্রদান এবং বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে সকলের কল্যাণে কাজ করবে এটাই প্রত্যাশিত।

৪৬. পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্যের জন্য কেউ কি পুলিশকে জানাতে পারে?

এটা সমস্যার ধরনের ওপর নির্ভরশীল। যা ঘটেছে তা যদি পারিবারিক সহিংসতা, নারী বা শিশুর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির মত অপরাধ হয় তবে অবশ্যই পুলিশ আক্রান্ত/ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করবে এবং এগুলো ব্যক্তিগত বিষয় বলে দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। কিন্তু যদি প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান অবাধ্য হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে, সে বিয়ের উদ্দেশ্যে পরিবার ত্যাগ করেছে, তবে তাকে ধরে নিয়ে আসা বা ফিরিয়ে আনার জন্য বল প্রয়োগ করা পুলিশের কাজ নয়। এটা সম্পূর্ণ পারিবারিক বিষয়। আত্মীয়দের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে মালিকানা নির্ধারণও পুলিশের কাজ নয়।

৪৭. যদি পুলিশ সহায়তা না করে বা আশেপাশে পুলিশ না থাকে তাহলে কি কেউ কোন চোর বা অন্যায়কারীকে ধরতে ও তৎক্ষণাৎ তাকে শাস্তি দিতে পারে?

এক্ষেত্রে প্রথমটির উত্তর হ্যাঁ এবং দ্বিতীয়টির উত্তর না। অন্যায়কারীকে আটক করে তাকে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে হবে। এটাই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ অন্যায়কারীকে মারতে পারে না। তবে শুধু নিজেকে রক্ষা করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তা করার অধিকার একজন নাগরিকের রয়েছে, যা আত্মরক্ষার অধিকার নামে পরিচিত।

আবার কোন পুলিশ যদি নিজে আইন ভঙ্গ করে বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার সাথে যোগ দেয়, তবে সেও শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এমনকি সরাসরি ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগও তার বিরুদ্ধে আনা যেতে পারে।

৪৮. যদি পুলিশ কাউকে সাহায্য না করে, তাহলে সে কী করবে?

একজন পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে তার দায়িত্ব পালন না করলে অথবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদি পুলিশ কাউকে সাহায্য না করে এবং এর জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে সে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারে এবং ঐ ঘটনায় পুলিশ দায়িত্বে অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হতে পারে।

৪৯. পুলিশ যা চায় তাই কি করতে পারে?

আদৌ না। যা আইনানুগ শুধু তাই তারা করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, তারা অনেক বেশি আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। এগুলো হলো তাদের নিজস্ব আইন, প্রবিধান, ফৌজদারি কার্যবিধিতে বর্ণিত নিয়মাবলী, উচ্চ আদালতের নির্দেশনাবলী ইত্যাদি।

৫০. পুলিশ যদি ঐ সকল আইন-কানুন না মানে, সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে কেউ ঐ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করা এবং এর একটি গৃহীত অনুলিপি নেয়া সব সময়ের জন্য ভাল।

৫১. একজন পুলিশের বিরুদ্ধে কী কী বিষয়ে অভিযোগ করা যায়? কেউ যদি স্থানীয় থানায় ঐ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং থানা কর্তৃপক্ষ ঐ অভিযোগ গ্রহণ না করে সেক্ষেত্রে অভিযোগকারীর করণীয় কী?

একজন পুলিশ কর্তৃক যেকোন ধরনের অন্যায় কাজের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেতে পারে।

এটা প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু বিষয়টি একরম হওয়া উচিত নয়। কেউ পুলিশের রূঢ় বা অশিষ্ট ব্যবহার বা দায়িত্বে অবহেলা বা পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে পুলিশ প্রধানের কাছে কিংবা এটা যদি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে তাহলে নিকটস্থ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

৫২. পুলিশ যদি কারো সাথে রূঢ় ব্যবহার করে বা কাউকে অপমান করে তাহলে তার করণীয় কী?

যদি বিষয়টি দায়িত্ব বা শৃঙ্খলার বরখেলাপ হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি দোষী পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে পারে। কিন্তু অপরাধ যদি অধিকতর গুরুতর হয়, তবে পুলিশ স্টেশনে লিখিতভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে অথবা স্থানীয় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

৫৩. কিন্তু বিষয়টি কোর্টে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন এবং এটা নিষ্পত্তির জন্য অনেক সময় প্রয়োজন!

যেকোন মামলাতেই দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে। এটি আমাদের আইনি পদ্ধতি ও আদালত ব্যবস্থাপনার ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন, তা দ্রুত তদন্ত ও মামলা দায়েরের জন্য কোন কোন দেশে যেমন ভারত, মালদ্বীপে বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদের দেশেও ঐ ধরনের সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। তবে বর্তমান আইনি কাঠামোতে আমাদের দেশে পুলিশ সম্পর্কে সুর্নিদিষ্ট অভিযোগ থাকলে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত হলে দুর্নীতি দমন কমিশনেও অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।

৫৪. কেউ যদি কোন অপরাধ সম্পর্কে পুলিশকে জানাতে চায়, তাহলে তাকে কী করতে হবে?

যদি এটা হত্যা, ডাকাতি, দস্যুতা, চাঁদাবাজি, চুরি, ঘরভাঙ্গা, শারীরিক আঘাত, নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ, পাচার, দাঙ্গা প্রভৃতি অর্থাৎ আমলযোগ্য গুরুতর অপরাধ হয়, তাহলে অতিসত্ত্বর সরাসরি স্থানীয় থানায় এজাহার দায়ের করা যেতে পারে এবং থানা কর্তৃপক্ষ তা লিখিতভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য। যদি পুলিশ এজাহার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে লিখিত অভিযোগ নিয়ে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও যাওয়া যেতে পারে। বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট সেটা লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫৫. এফআইআর কী?

এটা First Information Report (FIR) বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর সংক্ষিপ্ত রূপ। আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি, সাক্ষী বা অপরাধ সম্পর্কে জানে এমন কোন ব্যক্তি এফআইআর দায়ের করতে পারে। এফআইআরে যা উল্লেখ করা হয় তার ওপর ভিত্তি করেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং তদন্ত শেষে অভিযোগের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি লিপিবদ্ধ করে একটি লিখিত রিপোর্ট দাখিল করে।

৫৬. শুধু কি স্থানীয় থানায় নাকি যেকোন থানায় এজাহার করা যায়?

যেকোন **থানায়** এজাহার করা যায়। তবে যে থানার এলাকার মধ্যে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে, সে থানায় যাওয়াটাই শ্রেয়, কারণ এতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। যদি কেউ অন্য থানায় এজাহার করে, পুলিশ সেই অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য এবং তা সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠিয়ে দেয়। অপরাধটি তাদের কর্মএলাকার মধ্যে ঘটেনি এ কথা বলে তারা এজাহারটির অন্তর্ভূক্তি প্রত্যাখান করতে পারে না। যদিও আমাদের দেশে এ ধরনের প্রত্যাখান হরহামেশাই হয়ে থাকে।

৫৭. পুলিশ কি কারো অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকার করতে পারে?

আমাদের দেশে অপরাধকে আমলযোগ্য অপরাধ এবং আমল-অযোগ্য অপরাধ এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমলযোগ্য অপরাধ যেমন হত্যা, ধর্ষণ, দাঙ্গা, ডাকাতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এফআইআর রেকর্ড এবং অনুসন্ধান শুরু করা পুলিশের আবশ্যিক দায়িত্ব। এছাড়া, আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতিরেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা যায়। আমল-অযোগ্য অপরাধ যেমন ঠকানো, প্রবঞ্চনা, জালিয়াতি, বহু বিবাহের অভিযোগ, ওজনে কম দেয়া, অথবা জনউৎপাত সৃষ্টি করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর তদন্ত শুরু হয়। এই পার্থক্য সহজে বুঝতে গেলে বলা যায়, যে সমস্ত অপরাধ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলি সরাসরি পুলিশের কাছে অভিযোগ করা যেতে পারে এবং বাকিগুলো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করা যেতে পারে। পুলিশ যদি কারো আমল-অযোগ্য অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ না করে, তবে তার উচিত অভিযোগটি শুনে খুব সংক্ষিপ্তভাবে তা প্রতিদিনের ডায়েরিতে অন্তর্ভূক্ত করে একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি প্রদান করা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া।

৫৮. যদি কারো এজাহার আমলযোগ্য অপরাধ সংক্রান্ত হয় এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ডিউটি অফিসার তা রুজু করতে অস্বীকার করে, তখন এজাহারকারী কী করতে পারে?

সেক্ষেত্রে এজাহারকারী তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা জেলা পুলিশ প্রধান বা নিকটস্থ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে এবং তারা তা নিবন্ধনের নির্দেশ প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য এজাহারকারী হাতে হাতে বা প্রাপ্তিস্বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে অভিযোগ পাঠানো যায়। এক্ষেত্রে ডাক রশিদ ও প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রমাণ করে যে, এটি গৃহীত হয়েছে। ফলে অভিযোগটির সঠিক তদন্ত হবে এটাও প্রত্যাশা করা যায়।

তবে এজাহার রুজু করার ক্ষেত্রে এজাহারকারী যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলো সেগুলো তুলে ধরা উচিত। এর ফলে পরবর্তী কর্মকর্তা কর্তৃক পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা কমে যায়। তবে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে স্বশরীরে হাজির থাকতে হয়।

৫৯. এজাহারে কী কী থাকা দরকার?

এজাহার হচ্ছে, কোন ব্যক্তি সংঘটিত অপরাধ সম্বন্ধে যা জানে বা তাকে যা জানানো হয়েছে তা নিজের মতো করে বর্ণনা। যদি এজাহার দায়েরকারী ব্যক্তি ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী হন, তাহলে খুব ভালো। কিন্তু ঘটনাটি যে তাকে প্রত্যক্ষ করতেই হবে, তা জরুরি নয়। যাই ঘটুক না কেন সঠিক তথ্য দিতে হবে। ঘটনাটি অতিরঞ্জিত বা ঘটনার সাথে অনুমান করে কাউকে সম্পৃক্ত করা কখনই ঠিক নয়।

এজাহারে ঘটনার স্থান, তারিখ ও সময় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা যেমন: তারা কোথায় ছিল, কী করছিল, ঘটনার সময় প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থান কী ছিল, হতাহতের ধরন বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি সতর্কতার সাথে বর্ণনা করতে হবে। ঘটনায় অস্ত্র ব্যবহৃত হলে কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এজাহার দায়ের করা ভাল। যদি তা করতে বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই বিলম্বের কারণ উল্লেখ করতে হবে।

৬০. কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, এজাহারকারী যা বলেছিল পুলিশ তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছে?

মূলত এজাহারকারী যা জানে, তা তার মত করে বর্ণনাই এজাহার। এই এজাহারটি যখন নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে এফআইআর বলে। এখানে পুলিশের কোন ভাষ্য থাকবে না, পুলিশের কাজ হল কোন কিছু যোগ না করে বা কোন বিষয় বাদ না দিয়ে সঠিকভাবে তা লিপিবদ্ধ করা। দায়েরকারীর ভাষ্য নিশ্চিত হওয়ার নিয়ম হচ্ছে, পুলিশ এফআইআরটি তার সম্মুখে পড়বে এবং সে যদি মনে করে বা সম্মতি প্রদান করে যে, যা লেখা হয়েছে তা সঠিক সেক্ষেত্রে সে তাতে স্বাক্ষর প্রদান করবে। পুলিশ এজাহার দায়েরকারীকে বিনামূল্যে এর একটি হুবহু অনুলিপি অবশ্যই প্রদান করবে। এফআইআর রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর এর একটি অনুলিপি তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং আরেকটি কপি বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করা হয়।

৬১. এফআইআর রুজুর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ কী?

এফআইআর লিপিবদ্ধ হবার পরে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে নিজে তদন্তের ভার গ্রহণ করবে অথবা কোন সাব-ইন্সপেক্টর বা এখতিয়ার সম্পন্ন অন্য কোন পুলিশ সদস্যকে অপরাধটি তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করবে এবং এফআইআরটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটস্থ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবে। তদন্তের অংশ হিসেবে পুলিশ আসামিকে গ্রেফতার, ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ এবং সাক্ষীদের সাথে কথা বলতে পারে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মৃত্যুকালীন ঘোষণাসহ বিবৃতি রেকর্ড করবে, ভালভাবে অপরাধস্থল পর্যবেক্ষণ করে ম্যাপ প্রস্তুত করবে, ঘটনার আলামত সংগ্রহ ও প্রয়োজনে তা রাসায়নিক পরীক্ষা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করবে। স্থানীয় লোকজনকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে, গেফতারকৃত আসামী দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিতে ইচ্ছুক হলে উহা লিপিবদ্ধ করার পদক্ষেপ নিবেন এবং পাশাপাশি অধিকতর তদন্ত চালিয়ে যেতে পারে। তদন্ত শেষে তদন্ত কর্মকর্তা বিস্তারিত প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করবে এবং তা আদালতে জমা দিবে। একে পুলিশ রিপোর্ট বলা হয়। এই পুলিশ রিপোর্ট চার্জশিট অথবা ফাইনাল রিপোর্ট হতে পারে।

৬২. মুন্সি বা রাইটার কে? তারা কি পুলিশ বাহিনীর সদস্য?

যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন থানায় অর্থ বা বকশিশের বিনিময়ে অভিযোগকারীদের জিডি, এফআইআর বা এজাহার লিখে দেয় তাদেরকে মুন্সি বা রাইটার বলে।

মুন্সি বা রাইটার পুলিশের সদস্য নয় বা কোন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিও নয়। বিভিন্ন থানায় পুলিশ সদস্যরা কাজের চাপ লাঘবে নিজেরা সমঝোতার ভিত্তিতে জিডি, এফআইআর বা এজাহার মুসাবিদার জন্য তাদের নিয়োজিত করে।

৬৩. চার্জশিট বা অভিযোগপত্র কী?

কোন অভিযোগের তদন্ত শেষ হওয়ার পর তদন্ত কর্মকর্তা যদি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয় যে, ঘটনার সাথে অভিযুক্তদের সম্পৃক্ততা রয়েছে তাহলে সে আদালতে উপস্থাপনের জন্য যে রিপোর্ট প্রস্তুত করে, তাই চার্জশিট বা অভিযোগপত্র। আদালত চার্জশিটটি গ্রহণ করে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে পারে অথবা এজাহারকারীর (যদি সে নারাজি হয়) প্রেক্ষিতে প্রদান করতে পারে।

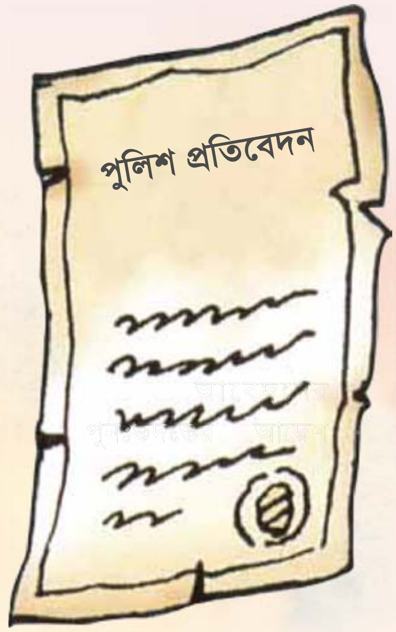

৬৪. এফআইআর এ অন্তর্ভুক্ত সকলকে কি পুলিশ ইচ্ছা করলে গ্রেফতার করতে পারে?

একটি আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আনীত এজাহারে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখিত যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষমতা পুলিশের রয়েছে। তবে শুধু এজাহারে নামের অন্তর্ভূক্তি একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের যথেষ্ট কারণ নয়। ঐ ব্যক্তির অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এ রকম মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকলেই গ্রেফতার করা যেতে পারে।

৬৫. পুলিশ কি কারো অভিযোগ নথিজাত করতে বা এর বিষয়ে আর কোন পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে?

যদি পুলিশ তদন্তের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, এমন কোন তথ্য-প্রমাণ নেই যাতে অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ মেলে অথবা সংগঠিত অপরাধটির জন্য কে বা কারা দায়ী তদন্তে তা উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়, এ সকল ক্ষেত্রে পুলিশ কারণ প্রদর্শন করে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করতে পারে। তবে পুলিশ অবশ্যই অভিযোগকারীকে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে, যাতে করে অভিযোগকারী ইচ্ছা করলে কোর্টে এই রিপোর্টের বিরোধিতা করতে পারে। মামলা নথিজাত করা বা ডিসচার্জ করার চূড়ান্ত আদেশ দেবে আদালত।

৬৬. কেউ কি তার মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য পেতে পারে?

এ বিষয়ে আইনে সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই যে, পুলিশ মামলাটির অগ্রগতি সম্পর্কে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করবে কিন্তু মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে তার ফলাফল সম্পর্কে অভিযোগকারীকে জানানোর আইনি বিধান রয়েছে। তদন্ত কার্যক্রমকে ব্যাহত না করে মামলাটি কিভাবে চলছে তা অভিযোগকারীকে জানানো যেতে পারে।

৬৭. পুলিশ যদি কোন অভিযোগের তদন্ত না করে বা তদন্ত ধীর গতিতে করে বা তদন্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বিবেচনা না করে, তাহলে কি করা যেতে পারে?

আইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল, পুলিশের তদন্ত কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদিও তদন্তের সময়সীমা আইন দ্বারা নির্ধারিত। তবে, যদি পুলিশ তদন্ত এগিয়ে না নেয় অথবা অতি ধীর গতিতে চলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তে অবশ্যম্ভাবী দিকগুলোকে বিবেচনায় না আনে, সেক্ষেত্রে অভিযোগকারী অবশ্যই তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বা এখতিয়ারসম্পন্ন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে পারে। তারা পুলিশকে যথাযথ তদন্তের জন্য নির্দেশ দিতে পারে, তদন্তের নথি তলব করতে পারে এবং প্রয়োজনে তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন করতে পারে এমনকি সিআইডি বা অন্য কোন শাখা দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে।

৬৮. প্রয়োজন হলে কেউ কি পুলিশের সাহায্য চাইতে পারে?

পুলিশকে অনেক ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং তাদের সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয়। কাজেই ছোট খাটো কোন বিষয়ের জন্য সব সময় পুলিশের সাহায্য চাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কেউ যখন কোন বড় সমস্যায় পড়ে, অর্থাৎ গুরুতর অপরাধের শিকার হওয়ার সম্মূখীন হয় তখন সে পুলিশের সাহায্য চাইতে পারে। কোন গুরুতর অপরাধ যেমন হত্যা, ধর্ষণ, দাঙ্গা, ব্যাপক ভাংচুর ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড, ডাকাতি, দস্যুতা, আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি প্রভৃতি ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, তখন পুলিশের সাহায্য কামনা করা যায় এবং সেক্ষেত্রে পুলিশেরও দায়িত্ব দ্রুততম সময়ে সাড়া দেয়া।

৬৯. পুলিশ কি কোন ব্যক্তিকে যথাযথভাবে অবহিত না করে তার বাসায় তল্লাশি এবং জিনিসপত্র জব্দ করতে পারে?

শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পুলিশ এটা করতে পারে। যদি কোন পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তার অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু পুলিশের কাছে যদি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকে যে, কেউ কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা অপরাধীকে লুকানোর চেষ্টা করছে, অথবা তার কাছে যদি চুরিকৃত সম্পদ, জাল মুদ্রা, জাল দলিল ও অবৈধ অস্ত্র থাকে, তাহলে পুলিশ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে তার বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু যদি সন্দেহভাজন ব্যক্তি, অপরাধী বা অবৈধ বস্তু দ্রুত জব্দ না করলে, পালানোর, হারানোর বা বিনষ্টের ভয় থাকে, তাহলেই পুলিশ কোন ধরনের ওয়ারেন্ট ছাড়াই যেকোন ব্যক্তির বাসায় প্রবেশ করতে পারে।

৭০. এর অর্থ কি এই যে, পুলিশ যে কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে এবং জিনিসপত্র জব্দ করতে পারে?

না। এটা বিশেষ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র জরুরি হলেই করতে পারে। যেমন, যদি এরকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে, একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি পালিয়ে যেতে পারে অথবা প্রমাণাদি নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাহলেই কোন ওয়ারেন্ট ছাড়া পুলিশ কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে।

ওয়ারেন্ট অথবা ওয়ারেন্ট ছাড়া কারো বাসায় প্রবেশ এবং তল্লাশির ক্ষেত্রে পুলিশকে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। পুলিশের সাথে স্থানীয় দু'জন নিরপেক্ষ সাক্ষী থাকতে হবে। সাক্ষীদের উপস্থিতিতেই তল্লাশি সম্পন্ন করতে হবে। বাড়ির মালিককে স্থান ত্যাগ করতে বলা যাবে না। পুলিশ অবৈধ বা সন্দেহজনক যে জিনিসগুলো নিয়ে যাবে তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। জব্দ তালিকায় পুলিশ, বাড়ির মালিক এবং সাক্ষীরা অবশ্যই স্বাক্ষর করবে। বাড়িতে কোন পর্দানশীন নারী থাকলে পুলিশ ফোর্সের সাথে একজন নারী সদস্য থাকতে হবে এবং তারা সম্পূর্ণ শালীনতা বজায় রেখে তল্লাশি পরিচালনা করবে।

৭১. সার্চ ওয়ারেন্ট কী?

কোন তদন্ত পরিচালনা বা অপরাধ দমনের প্রয়োজনে কোনস্থান/গৃহ/স্থাপনা হতে কোন দলিল, জাল মুদ্রা, অস্ত্র, অন্যায়ভাবে আটককৃত ব্যক্তি, চুরি হওয়া সম্পদ ইত্যাদি উদ্ধারের জন্য ঐ স্থান/গৃহ/স্থাপনায় প্রবেশ করে, তা তল্লাশির জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিখিত অনুমতিকেই সার্চ ওয়ারেন্ট বলা হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, মানুষের বাড়ি ও অফিস হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সেখানে তল্লাশি বা প্রবেশের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট কারণ থাকতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে তল্লাশি পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার কোনভাবে যেন লজ্ঘিত না হয়। আইন অনুসারে কোন ব্যক্তির কার্যক্রম দ্বারা অন্যের অধিকার ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করতে হবে। কাজেই পুলিশকে কোন স্থানে তল্লাশি চালাতে হলে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, ঐ স্থানে কোন দ্রব্য, কাগজপত্র অথবা ব্যক্তি লুকিয়ে আছে এবং তা অপরাধ দমনে সহায়ক হবে। যদি ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, পুলিশ কর্মকর্তার দাবি যুক্তিগ্রাহ্য তবে তিনি অনুমতি দিবেন। এই ক্ষমতা খুবই সীমিতভাবে বিশেষ পদের পুলিশ কর্মকর্তাকে কোন বিশেষ স্থানে তল্লাশি চালানোর অনুমতি দিয়ে থাকে এবং অনুমতিপত্রে আদালতের স্বাক্ষর ও সীলমোহর থাকে।

৭২. পুলিশ কি কোন ব্যক্তিকে রাস্তায় থামিয়ে যেকোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে?

সাধারণত জনগণের কোন বৈধ কার্যক্রমে পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু যদি কেউ কোন স্থানে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে বলে মনে হয়, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর, তবে পুলিশ তাকে থামিয়ে তার নাম, ঠিকানা ও ঘোরাফেরার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইতে পারে। যদি তার মধ্যে যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহজনক কিছু দেখা যায়, বা তার উত্তর অসংলগ্ন মনে হয় তাহলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে। সন্দেহভাজন বা পেশাদার অপরাধীদের গ্রেফতারে পুলিশ প্রায়ই এই ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে।

৭৩. পুলিশ কী কোন ব্যক্তিকে শান্তিপুর্ণ মিছিল বা পথসভায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারে?

শান্তিপুর্ণ মিছিল, পথসভা, সমাবেশ, মতপ্রকাশ প্রভৃতি নাগরিকদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। কিন্তু নিয়মানুসারে কোন শান্তিপুর্ণ মিছিল বা সভা করতে হলে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নিতে হবে। যদি পুলিশ মনে করে যে, কোন মিছিল বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ ঘটাতে পারে তাহলে তারা অনুমতি নাও দিতে পারে। যদি কোন মিছিল আয়োজনের পর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তবে পুলিশ তা ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে, জনতাকে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে এমনকি তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রয়োজন হলে আক্রমণাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। পুলিশের দায়িত্ব হলো সবকিছু যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা এবং জনগণকে সহায়তা করা, যাতে তারা তাদের মৌলিক অধিকার যেমন মিছিল, জনসভা, সমাবেশ ইত্যাদি পালন করতে পারে।

৭৪. পুলিশ কি রাস্তায় জনসভা বা মিছিল বন্ধ করতে শক্তি ব্যবহার করতে পারে?

হ্যাঁ। কিন্তু পুলিশ যাই করবে তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ এবং আইনের সমর্থন থাকতে হবে। তারা জনগণকে শাস্তি দেয়ার জন্য নয় বরং জনগণের নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা যাতে বিঘ্ন না হয়, তা নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে আইন হলো, পুলিশ উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বা বেআইনি সমাবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার শেষ চেষ্টা হিসেবে তার শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তা হতে হবে সীমিত পর্যায়ে, অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যতটা সম্ভব স্বল্প শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা করা।

৭৫. পুলিশ কি ইচ্ছে করলেই গুলি চালাতে পারে?

আদৌ নয়। এটি হলো পুলিশের আক্রমণাত্মক শক্তিগুলোর অন্যতম এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সকল উপায় ব্যর্থ হলে এটা প্রয়োগ করা যায়। গুলি ব্যবহারের প্রথম পর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে হবে। এই শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি ও তার লিখিত অনুমতি প্রয়োজন।

৭৬. উচ্ছৃঙ্খল জনতা যদি আইন অমান্য করে, ঢিল ছোঁড়ে অথবা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে তখন পুলিশ কী করতে পারে?

জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পুলিশের কর্তব্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রমে ধারাবাহিকভাবে কতগুলো পর্যায় অনুসরণ করতে হয়। প্রথমে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বারবার সতর্ক করতে হবে। বারবার তারা সতর্কতা অগ্রাহ্য করলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস বা লাঠি চার্জ করতে পারে। লাঠি চার্জের ক্ষেত্রে কোমরের নীচের অংশে সীমিত রাখতে হবে, মাথা বা কাঁধে লাঠি দিয়ে আঘাত করা যাবে না। গুলি চালানোর মতো পরিস্থিতি উদ্ভব হলে জনতাকে পরিস্কারভাবে সতর্ক করে দিতে হবে। এখানেও আইন হলো এই শক্তির ন্যূনতম প্রয়োগ। কাজেই খুব সীমিত আকারে গুলির ব্যবহার করতে হবে এবং জনতার যে অংশ সবচেয়ে হুমকিস্বরূপ মনে হয়ে সেখানে এর প্রয়োগ করতে হবে।

কিন্তু গুলি চালানোর উদ্দেশ্য আঘাত করা নয়, বরং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা। জনতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই গুলি থামাতে হবে। আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। অবশ্যই সকল অফিসারকে তাদের ভূমিকার বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে এবং গুলি ব্যবহারের হিসাব প্রদান করতে হবে। প্রতিটি গুলি বর্ষণের ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর তার যথার্থতা নিরূপণের জন্য একটি বিভাগীয় তদন্তও সম্পন্ন করতে হয়।

৭৭. পুলিশ কি কোন ব্যক্তিকে গোপন স্থানে আটকে রাখতে পারে অথবা আটকের বিষয় অস্বীকার করতে পারে?

না। এটা সম্পূর্ণ আইন বিরোধী।

৭৮. পুলিশ কি কাউকে থানায় ডেকে আনতে পারে এবং সে কি তার ইচ্ছে অনুযায়ী চলে যেতে পারবে?

কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার না করা হয়ে থাকলে, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে থানায় আটকে রাখা যাবে না। পুলিশ যদি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাউকে ডেকে পাঠায় তবে পুলিশকে সহযোগিতা করা তার কর্তব্য। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের বিষয় হতে হবে বাস্তবসম্মত ও অর্থপূর্ণ এবং এই জিজ্ঞাসাবাদ অনির্দিষ্টকাল চলতে পারবে না। পুলিশ কাউকে থানায় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধরে রাখতে পারে না। ঐ ব্যক্তি চলে যেতে চাইলে তাকে যেতে দিতে হবে।

৭৯. যদি পুলিশ যেতে না দেয় তাহলে করণীয় কী?

কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া আটক করা হয়ে থাকলে, এবং তিনি যদি আমলযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত না হন, তবে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে থানায় আটকে রাখা গুরুতর অপরাধ। এটাকে বলে অবৈধ আটকাদেশ এবং এক্ষেত্রে আটককৃত ব্যক্তির পরিবার অথবা বন্ধুবান্ধবদের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পুলিশের বিরুদ্ধে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এমনকি প্রয়োজনে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঐ ব্যক্তি উচ্চ আদালতেও যেতে পারে এবং তার আইনজীবী বা নিকটজন তার মুক্তির জন্য হেবিয়াস করপাস রীট পিটিশন দাখিল করতে পারে।

৮০. হেবিয়াস করপাস কী?

শব্দ দুটি ল্যাটিন ভাষা থেকে নেয়া, যার আক্ষরিক অর্থ হলো সশরীরে হাজির করা। এটি অবৈধ আটকাদেশের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর আইনি পদক্ষেপ। এটা এক ধরনের রীট যা উচ্চ আদালত অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগ জরুরি ভিত্তিতে করতে পারে। যখনই আদালতে নিখোঁজ একজন ব্যক্তি সম্পর্কে আবেদন করা হয় যাকে সর্বশেষ পুলিশের হেফাজতে দেখা গেছে, তখন আদালত পুলিশকে আটককৃত ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির করার জন্য সমন জারি করে এবং আটকের সমর্থনে যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে ব্যর্থ হলে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার আদেশ জারি করে। এমনকি যদি আটকাদেশ অবৈধ প্রমাণিত হয় তাহলে ভিকটিমকে ক্ষতিপূরণ দেয়ারও নির্দেশ দিতে পারে উচ্চ আদালত।

৮১. অবৈধভাবে আটক ব্যক্তির অবস্থান জানা না গেলে অন্য কোন উপায়ে কি তার সম্পর্কে খোঁজ করা যাবে?

হ্যাঁ। পুলিশ হেফাজতে থাকা ঐ ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে জানতে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আবেদন করা যায়। যেহেতু এটি একজন ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত তাই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ আটক ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

৮২. কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে পুলিশ কি কাউকে গ্রেফতার করতে পারে?

না। কেবলমাত্র গ্রেফতারের সমর্থনে যথেষ্ট কারণ থাকলেই পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি কোন আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে অথবা তদন্ত চলাকালীন যদি তার সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া যায় অথবা কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের পূর্বে ও পরে সহায়তা করে থাকে তবে তাকে গ্রেফতার করা যাবে। গ্রেফতার করার জন্য 'যথাযথ কারণ' থাকতে হবে। শুধুমাত্র এজাহারে কারো নাম থাকলেই তা ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য যথাযথ কারণ বলে বিবেচিত হবে না।

৮৩. অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে কি তার পরিবারের সদস্যদেরও পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে?

কখনোই না। অপরাধ সবসময়ই অপরাধীর ব্যক্তিগত দায়। কোন ব্যক্তি অপরাধী না নিরাপরাধী তা তার ব্যক্তিগত কার্যক্রম দ্বারা বিচার করা হয়ে থাকে, কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বা সম্পর্কের দ্বারা নয়। নির্দিষ্ট আইনগত কারণ ব্যতিত কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। পরিবারের সদস্যদের বা বন্ধুদের পুলিশ হুমকি দিতে পারে না অথবা পলাতক আসামির ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে তাদের থানায় নিয়ে যেতে পারে না। এই ধরনের জিম্মি অবস্থা অবৈধ আটকাদেশ অথবা অপহরণ হিসেবে গণ্য হবে। যে কেস নিয়ে কাজ করছে তা যতই জটিল হোক না কেন পুলিশ সন্দেহভাজনকে তার স্বীকারোক্তি আদায়ে অবৈধ চাপ দিতে পারে না। যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের যুক্তিসংগত কারণ আছে বলে পুলিশ মনে করে শুধুমাত্র তাদেরকে গ্রেফতার করা যাবে।

৮৪. কোন নারীকে গ্রেফতার এবং পুলিশ হেফাজতে তাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে কি কোন বিশেষ আইন আছে?

আছে। বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের মধ্যে নারীকে গ্রেফতার করা যাবে না। একজন ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে ঐ সময়ের মধ্যে কোন নারীকে গ্রেফতার করার জন্য যথেষ্ট কারণ আছে তাহলেই কেবল তিনি বিশেষ লিখিত অনুমতি দিবেন। গ্রেফতারের সময় পুরুষ পুলিশের সাথে নারী পুলিশও থাকতে হবে। নারীদের থানায় আলাদা কক্ষে রাখতে হবে এবং যেকোন জিজ্ঞাসাবাদ বা শারীরিক তল্লাশি নারী পুলিশ অথবা ডাক্তারের মাধ্যমে হতে হবে। নারীদের ক্ষেত্রে সকল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ এবং সঠিকভাবে রেকর্ড করা পুলিশের নিজের স্বার্থেই নিশ্চিত করা উচিত।

৮৫. শিশুদের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা কী হবে? শিশুদের জন্য কি কোন বিশেষ প্রক্রিয়া আছে ?

২০১৩ সালের শিশু আইন অনুযায়ী ৯(নয়) বছরের নীচের কোন শিশুকে কোন অবস্থাতেই গ্রেফতার করা বা, ক্ষেত্রমত, আটক রাখা যাবে না। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এই বয়সের শিশুদের পুলিশ হেফাজতে নেয়া যাবে না। কিন্তু ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ, আটক, থানায় নেয়া, মুক্তি, জামিন ইত্যাদি বিষয়গুলো ২০১৩ সালের শিশু আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। আইনানুযায়ী প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোথাও কোন শিশুকে আটক রাখা যাবে না। শিশুদের কিছুতেই লকআপে রাখা যাবে না বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জামিনের ব্যবস্থা করে পিতামাতার কাছে হস্তান্তর করতে হবে। পিতামাতা না থাকলে অথবা শিশুর যদি খারাপ সংসর্গে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে তাহলে তাকে জুভেনাইল কোর্টে হাজির করার আগ পর্যন্ত স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী শিশুদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হবে একটি শিশুবান্ধব প্রক্রিয়ায়। প্রত্যেক থানাতে একজন শিশু বান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা থাকবে। কোন শিশুর অবস্থান আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তাৎক্ষনিক প্রবেশন অফিসারকে জানাতে হবে।

৮৬. নিরাপত্তা হেফাজত বা সেইফ কাস্টডি কি?

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে নিরাপত্তা হেফাজত বা সেইফ কাস্টডি হচ্ছে কোন অপরাধের বিচার চলাকালে কোন নারী বা শিশু আদালতের আদেশে কারাগারে বা কারাগারের বাইরে সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে সরকারি কর্তৃপক্ষের হেফাজতে বা আদালতের বিবেচনায় যথাযথ অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার হেফাজতে রাখা।

সরকারের যথাযথ ও পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাবে যে উদ্দেশ্যে আইনে এই বিধান রাখা হয়েছে তা ব্যাহত হচ্ছে। আদালত কোন নারী বা শিশুর নিরাপত্তা হেফাজতের আদেশ দিলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ অবকাঠামোগত স্বল্পতার কারণে কখনও কখনও কারাগারে অন্যান্য কয়েদিদের সাথে রেখেছে। ফলে উক্ত নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হতে পারে। নিরাপদ হেফাজতের পরিবর্তে তাদেরকে সাধারণ কয়েদিদের সাথে রাখা হয়, যা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। এখানে উল্লেখ্য যে, শিশুদের কারাগারে রাখা শিশু আইনে নিষেধ।

৮৭. গ্রেফতারকৃত কোন শিশু বা ব্যক্তিকে কি পুলিশ যতদিন ইচ্ছা আটক রাখতে পারে?

অবশ্যই না। একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পরে ২৪ ঘন্টার বেশি পুলিশ হেফাজতে রাখা যাবে না। এটাই হলো সর্বোচ্চ সময়সীমা। একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করতে হবে। শিশুর ক্ষেত্রে এই নিয়মের পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব শিশু বান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা, পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক ও প্রবেশন অফিসারের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৮৮. যদি কোন ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে গ্রেফতার করে পরের রবিবার পর্যন্ত থানায় আটক রাখা হয় সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

এটা অন্যায়। এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের পিছনে পুলিশ যুক্তি হিসেবে বলে যে, সপ্তাহের এ দিনগুলোতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কোন কার্যক্রম থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সপ্তাহের প্রতি দিনই এবং ২৪ ঘন্টা একজন ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর ২৪ ঘন্টা শেষ হওয়ার আগেই আদালতে হাজির করতে হবে। দিনের স্বাভাবিক কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় হাজির করতে হবে। এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট তার স্বাভাবিক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন হিসেবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিষয়টি দেখতে বাধ্য থাকবেন।

৮৯. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে অন্যরা কিভাবে জানবে?

পুলিশি প্রক্রিয়ার মধ্যে একজন ব্যক্তি যাতে নিখোঁজ হয়ে যেতে না পারে সেজন্য আইন ব্যক্তিকে অনেক ধরনের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পরপরই পুলিশকে অনেকগুলো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। গ্রেফতারের বিষয় সম্পর্কে একটি 'গ্রেফতারের চালানপত্র' তৈরি করে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হয়। পুলিশকে নিশ্চিত করতে হয় যাতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি তার নিজ ক্ষমতায় বা সরকারের আইনি সহায়তার মাধ্যমে দ্রুত একজন আইনজীবী নিযুক্ত করতে পারে। পুলিশকে অবশ্যই গ্রেফতারের বিষয়ে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী তার কোন একজন আত্মীয় বা পরিচিতকে অবহিত করতে হবে। পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার হ্রাস করার জন্য এসব বিষয়গুলোই আইন দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। পুলিশ এই আইনগুলো অনুসরণ না করলে আদালতে জবাবদিহি করতে হবে।

৯০. গ্রেফতারের চালানপত্র কি কাজে লাগবে?

এটা বেআইনি আটকের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচ। পুলিশ ফরওয়ার্ডিং এ অবশ্যই গ্রেফতারকৃতর নাম, গ্রেফতারের তারিখ ও সময়, গ্রেফতারের কারণ এবং সন্দেহমূলক অপরাধটি কি তা উলেখ থাকবে। এটি ম্যাজিস্ট্রেটকে দেয়া হবে এবং যখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রথম গ্রেফতারকৃতকে আনা হবে, তখন যা উল্লিখিত হয়েছে তা ঠিক কি না তিনি পুনরায় যাচাই-বাছাই করে দেখবেন।

৯১. পুলিশ কর্তৃক সন্দেহবশতঃ গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কে আদালতের কি কোন নির্দেশনা আছে?

সন্দেহবশতঃ গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কিত ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংশোধনের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট *ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ* [৫৫ডিএলআর (২০০৩) ৩৬৩] মামলায় নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করেছে। কেবলমাত্র ডিটেনশন দেয়ার বা আটক করার জন্য পুলিশ কাউকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারবে না। পুলিশকে গ্রেফতারের কারণ একটি বিশেষ ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তিন ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃতকে তা জানাতে হবে। গ্রেফতারের সময় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকলে পুলিশ তার কারণ উল্লেখ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে এবং কর্তব্যরত ডাক্তারের সনদ সংগ্রহ করবে। বাসা বা কর্মক্ষেত্র ছাড়া অন্যস্থান থেকে গ্রেফতার হলে তার নিকটাত্মীয়কে বিষয়টি জানাতে হবে এবং তার পছন্দসই আইনজীবী ও নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে দিতে হবে। অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশক্রমে কাঁচ নির্মিত বিশেষ কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। কক্ষের বাইরে তার আইনজীবী ও নিকটাত্মীয় থাকতে পারবে। জিজ্ঞাসাবাদে প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়া গেলে তদন্ত কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে সর্বোচ্চ তিনদিন জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। জিজ্ঞাসাবাদের আগে ও পরে ঐ ব্যক্তির ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে। পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া গেলে পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তবে হাইকোর্টের এই সকল নির্দেশনার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। কিন্তু নির্দেশনার উপর কোন স্থগিতাদেশ নাই।

৯২. একজন কিভাবে জানবে যে, সে কেন গ্রেফতার হয়েছে?

আইন অনুযায়ী গ্রেফতারের সময় পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে জারিকৃত ওয়ারেন্টসহ গ্রেফতারের কারণ জানাবে।

৯৩. পুলিশ কি কাউকে হেফাজতে থাকাকালীন মারধর করতে পারে?

না। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কাউকে মারতে, চড়-থাপ্পড়, হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন করতে পারে না। এটা আইন বিরুদ্ধ এবং এ ধরনের ঘটনার জন্য পুলিশ শাস্তি পেতে পারে।

৯৪. স্বীকারোক্তির জন্য পুলিশ কি কাউকে বাধ্য কিংবা জবরদস্তি করতে পারে?

না। তবে কাউকে প্রশ্ন করার অধিকার পুলিশের রয়েছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির যে তথ্য জানা নেই বা এমন কোন বিষয় যা তিনি বলতে চান না বা এমন কোন অপরাধ যা তিনি করেননি তা বলতে পুলিশ কাউকে বাধ্য বা জবরদস্তি করতে পারে না। পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না।

৯৫. "রিমান্ড" কাকে বলে? অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ কি নির্যাতন করতে পারে?

কোন মামলায় অভিযুক্ত ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের প্রয়োজনে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে পুলিশের হেফাজতে নেয়াকেই রিমান্ড বলে।

রিমান্ডে নিয়ে কোন অবস্থাতেই আটককৃত ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যায় না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি ও আটক ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। কিন্তু রিমান্ডের নামে প্রায়শই অত্যাচার নির্যাতন করা হয়ে থাকে। কখনো কখনো অবৈধ অর্থ আদায় করার চাপ সৃষ্টির জন্যও রিমান্ডকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে বলে অভিযোগ করা হয়।

৯৬. এত বিধি-নিষেধ থাকলে পুলিশ কি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন ও দোষী ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কাজটি করতে পারে?

কে দোষী বা দোষী নয় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া পুলিশের কাজ না। কেবলমাত্র সন্দেহভাজন ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরা বা পাকড়াও করার জন্যই পুলিশ। কিন্তু পুলিশ কারো সাথে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির মত আচরণ করতে পারে না। কাউকে শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার পুলিশের নেই। এটা আদালতের কাজ।

৯৭. অভিযুক্ত ব্যক্তির কি কোন অধিকার নেই? তার কী কী অধিকার রয়েছে?

একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থন ও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার অধিকার আইন স্বীকৃত। হয়ত সে আদৌ দোষী নয়। তাই একজন ব্যক্তি যার আত্মপক্ষ সমর্থন করা প্রয়োজন তার অনুকূলে রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভারসাম্য করার জন্য আইনে কিছু রক্ষাকবচ রয়েছে এবং কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে যেমন: যার সামর্থ্য নেই তাকে আইনগত সহায়তা প্রদান।

৯৮. অপরাধের শিকার ব্যক্তির বিচার প্রাপ্তির অধিকার রাষ্ট্র কিভাবে নিশ্চিত করে?

অনেকেই মনে করে অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে দেখার কেউ নেই। কিন্তু রাষ্ট্র ভিকটিমের পক্ষে অপরাধীকে খোঁজার কাজে নিয়োজিত হয় এবং আদালতে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য একজন সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করে। ভিকটিমের পক্ষে রাষ্ট্র দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করে।

৯৯. কেউ কি পুলিশের নিকট হতে জামিন পেতে পারে? কোন কোন অপরাধ জামিনযোগ্য এবং কোন কোন অপরাধ জামিন-অযোগ্য তা জানা কি গুরুত্বপূর্ণ?

এটা অপরাধের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি কেউ কোন অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে থাকে তাহলে সে পুলিশের নিকট হতে মুচলেকা দিয়ে জামিন পেতে পারে। তবে তাকে মুচলেকায় ছাড়ার পূর্বে তার নাম ঠিকানা, বাসস্থান ও পরিচিতি সম্পর্কে পুলিশকে নিশ্চিত হতে হবে।

জামিনযোগ্য অপরাধগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ যেখানে জামিন পাওয়া একটি অধিকার। জামিন-অযোগ্য অপরাধগুলো গুরুতর অপরাধ, যেখানে আদালত তার বিবেচনায় মনে হলে আসামির জামিন মঞ্জুর করতে পারে।

১০০. কেউ যদি একটি জামিন-অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয় তাহলে কি সে কখনও জামিন পাবে না?

না, ঠিক তা নয়। কেউ জামিন-অযোগ্য অপরাধেও জামিন পেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই জামিনের জন্য আদালতে আবেদন করতে হবে। আদালত অপরাধের গুরুত্ব দেখবে, জামিনে মুক্ত হয়ে সে পালিয়ে যাবে কি না কিংবা সে সাক্ষীদের হুমকি দিবে কি না বা সাক্ষ্য প্রমাণে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করবে কি না ইত্যাদি বিবেচনা করবে। যদি আদালত যথাযথভাবে বুঝতে পারে যে সে উপরে উল্লিখিত কোনটি করবে না এবং আনীত অভিযোগের সাথে তার সংশিষ্টতার সম্ভাবনা নেই বা কম, তাহলে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করতে পারে।

১০১. জামিনের পর কি তাকে মুক্ত বুঝায়?

না। একজন মানুষ জামিনে থাকলে, তাকে আদালতের হেফাজতে বলে ধরে নেয়া হয়। তাকে এমতাবস্থায় বিচারের মুখোমুখি হতে হয় এবং আদালত সিদ্ধান্ত নেয় সে দোষী না নির্দোষ।

পুলিশের পদবী অনুযায়ী ব্যাজ

সূত্র: *www.police.gov.bd*

নাগরিক উদ্যোগ

বেসরকারি সংস্থা হিসেবে 'নাগরিক উদ্যোগ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। নাগরিক উদ্যোগ সংগঠন হিসেবে কী করতে চায় বা কী করছে তারই সারবস্তু মূর্ত হয়ে আছে তার নামে। প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে সাহায্যে করে। দ্বিতীয়ত, সচেতন জনসাধারণের স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি নির্মাণে সক্ষম ও সমর্থ করে গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরিও নাগরিক উদ্যোগ-এর একটা কাজ।

সাধারণভাবে নাগরিক উদ্যোগ-এর লক্ষ্য হলো 'সুশাসন ও মানবাধিকার'-এর সুরক্ষা ও বিকাশে তৎপরতা চালানো এবং বিশেষভাবে 'স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় সরকারকে'-কে শক্তিশালী করা। নাগরিক উদ্যোগ-এর কর্মকান্ডে অন্যতম একটি মনোযোগের ক্ষেত্র হলো, প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া। গ্রামীণ সালিশদারদের মানবাধিকার ও আইন বিষয়ে সচেতন করা এবং সেই সাথে তৃণমূল নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা ও সালিশী ব্যবস্থাসহ সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাড়ানো।

যে আদর্শ দ্বারা নাগরিক উদ্যোগ-এর সামগ্রিক নীতি-কৌশল পরিচালিত হয় তা হলো, গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট নয়, শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায় না, বিশেষত, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের জীবনে। এ বোধ থেকে নাগরিক উদ্যোগ জোর দেয় তৃণমূলে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশের উপর।

নাগরিক উদ্যোগ-এর সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম

সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসা: প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন স্তরের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিবর্গকে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্থানীয় বিরোধ সালিশ ও সমঝোতার মাধ্যমে মিমাংসা করা।

তৃণমূল নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন: তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ বাড়ানো। এই কার্যক্রমের ফলে তৃণমূল নারীদের নেতৃত্ব বিকশিত হয়েছে এবং তারা পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ ও বিরোধ মিমাংসায় সালিশে নারী নেত্রী হিসেবে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে।

আইনগত সহায়তা ও মানবাধিকার তথ্যানুসন্ধান: সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসায় ব্যর্থ হলে অথবা ফৌজদারী আদালতের ক্ষেত্রে মামলা পরিচালনায় ক্ষমতা নেই এমন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনি পরামর্শ ও আদালত পর্যায়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তার তথ্যানুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা রাখা।

প্রশিক্ষণ ও মানবাধিকার শিক্ষা: নাগরিক উদ্যোগ অধিকার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও সাধারণ আইন- বিশেষ করে, পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা ইউনিয়ন ও উপজেলাভিত্তিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দল গঠন করে সংঘবদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

দুঃস্থ নারীদের সাথে কার্যক্রম: কর্মএলাকায় তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্ত, বিধবা ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত দুঃস্থ নারীদের সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী প্রাপ্ত সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, আইনগত অধিকার ও সামাজিক কুসংস্কার এবং বাধা অতিক্রমে সক্ষম করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আধিকার আদায়ে কার্যক্রম: দলিতদের অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দলিতদের সংগঠিত করা, নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা এবং দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি এবং আইন প্রণয়নে কাজ করা। এই কাজে নাগরিক উদ্যোগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য অধিকার: ২০০৪ সাল থেকে নাগরিক উদ্যোগ তথ্য অধিকার নিয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। বর্তমানে দেশের ৯টি থানায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা ও এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে কাজ চলছে।

শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক নারী শ্রমিক: শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ দ্রুত বেড়েই চলছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সমবায় করতে উৎসাহ দেয়া ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কাজ করা।

গণনাটক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: নাটক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানবাধিকার, নারীর মানবাধিকার ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশেষত নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য তুলে ধরার চেষ্টা করা।

যুব সমাজের সাথে কার্যক্রম: যুবকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র ও যুবকদের মানবাধিকার ও আইন সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবাধিকার ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ছাড়াও দেশের ১৯টি জেলা শহরে ব্লাস্টের শাখা কার্যালয় রয়েছে। ব্লাস্ট এর লক্ষ্য হচ্ছে দেশের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে আইন সহায়তা প্রদান, ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, নিরপেক্ষ, বন্ধুসুলভ ও আধুনিক। আইন সহায়তার পাশাপাশি ব্লাস্ট PIL এবং Advocacy এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, সংস্কার সাধন এবং বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে ব্লাস্ট নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে:-

ক) বিনামূল্যে আইন সহায়তা ও সালিসের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি: ব্লাস্ট বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শের পাশাপাশি নির্যাতিত, অসহায় ও গরীব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সালিসের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তিও বিনামূল্যে মামলা পরিচালনা করে। নারী নির্যাতনের মামলাসহ পারিবারিক, যৌতুক, বহুবিবাহ, শ্রম, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহ পরিচালনা করে। এছাড়া ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং মামলার দ্রুত বিচার নিস্পত্তি করার লক্ষ্যে ব্লাস্ট ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত মামলায় প্রসিকিউশনকে সহায়তা করে। অপরদিকে প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের যে কোন স্থান থেকে পাঠানো গরীব ও অসহায় মানুষের মামলাসমূহ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট এবং আপীল বিভাগে বিনামূল্যে পরিচালনা করা হয়।

খ) তথ্যানুসন্ধান বা তদন্ত: ব্লাস্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনার তথ্যানুসন্ধান বা তদন্ত একক এবং যৌথভাবে পরিচালনা করে। এছাড়া পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়, যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ) সচেতনতা কার্যক্রম: ব্লাস্ট স্থানীয় গরীব, অসহায় জনসাধারণ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও বিশেষ করে শ্রমিক ও বস্তিবাসী মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সচেতনতা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় আইন, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে জানানো এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিচার প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: ব্লাস্ট অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক-এর মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, প্যানেল আইনজীবী, স্টাফ, শ্রমিক, কারখানার মধ্য-পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সালিস, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় আইন, শ্রম আইন, জেন্ডার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

ঙ) জনস্বার্থ মামলা (PIL): ব্লাস্ট ১৯৯৪ সাল থেকে জনস্বার্থ মামলা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত ব্লাস্ট ৮৪ টি জনস্বার্থ (PIL) মামলা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রতিবন্ধীদের চাকুরীর সুযোগ, অবৈধভাবে বস্তি উচ্ছেদ রোধ, অবৈধ পাহাড় কাটা ও নির্মাণ কাজ রোধ, অবৈধ জমি অধিগ্রহণ রোধ, স্থানীয় সরকার যেমন- গ্রাম সরকার ও গ্রাম পরিষদ আইনের বৈধতা, ক্ষতিপূরণ আদায়, নিরাপত্তা ও ন্যায্য মজুরী আদায়, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা অপপ্রয়োগ রোধ, বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড প্রতিরোধ, সরকারী চাকুরীতে নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধ, পরিবেশ রক্ষা, ভোক্তা অধিকার, স্বাস্থ্যঝুঁকি ও চিকিৎসায় অবহেলা রোধ, বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামে ডিস্ট্রিক্ট, সেশন কোর্ট এবং পারিবারিক কোর্ট স্থাপন, সালিসের নামে বেআইনী সাজা বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তির নামে শিশুদের নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত মামলা।

চ) অধিপরামর্শ (Advocacy): মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী, আইন ও পলিসির সংশোধন, পরিবর্তন, বাস্তবায়নের জন্য ব্লাস্ট অধিপরামর্শমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে। ব্লাস্ট একদিকে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন আইন, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করছে। অপরদিকে বারের আইনজীবী, সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিচার বিভাগের প্রতিনিধি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সংবেদনশীল এবং সচেতন করাসহ বিভিন্ন আইন ও নীতি বিষয়ে গবেষণা, জরিপ, সভা, ওয়ার্কশপ, সংলাপ ও সেমিনারের মাধ্যমে মতামত বা সুপারিশ সংগ্রহ করে থাকে। এ সকল সুপারিশ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন এবং পরিবর্তন, পরিবর্ধনের জন্য কার্যকরী এডভোকেসী ও লবি করে।

ছ) ইমপ্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজনস প্রকল্প: ব্লাস্ট দেশের কারাগারের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে GIZ এর সহায়তায় এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলা কারাগারে কাজ করছে এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীসহ অসহায়,আর্থিকভাবে অসচ্ছল বন্দীদের মুক্তির জন্য আইন সহায়তা প্রদান করছে।

জ) প্রমোটিং জেন্ডার জাস্টিস থ্রু লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অব লোকাল কমিউনিটি ইন রুরাল বাংলাদেশ প্রকল্প: ব্লাস্ট Diakonia এর সহায়তায় ৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিরোজপুর, দিনাজপুর, যশোর এবং কুমিল্লা জেলার ৪ ইউনিয়নের ৩৬টি ওয়ার্ডের তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সালিসের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি, সচেতনতা কার্যক্রমসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঝ) রাইটস টু ওয়ার্কার এন্ড কনজিউমার সেইফটি এন্ড পাবলিক একাউন্টেবিলিটি ইন বাংলাদেশ প্রকল্প: প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি Regulatory body র কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকরী করায় সহায়তা করা এবং বিভিন্ন আইন ও পলিসি সংশোধনে এডভোকেসি করা।

ঞ) গবেষণাকর্ম, আইন বিষয়ক পুস্তিকা, প্রতিবেদন, আইনগ্রন্থ এবং বুলেটিন প্রকাশ: ব্লাস্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম, বুকলেট, লিফলেট, বুলেটিনসহ আইন বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করে। এছাড়া ব্লাস্টের কার্যক্রম এবং ইস্যুভিত্তিক একটি ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হয়।

সিএইচআরআই-এর কার্যক্রমসমূহ

সিএইচআরআই কাজ করছে প্রধানত কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে। সিএইচআরআই বিশ্বাস করে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ডে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রয়োজন এ সব কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা। অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে মানসম্মত কার্যকর কাঠামো থাকতে হবে। এই বিশ্বাসই সিএইচআরআই-এর সকল কার্যক্রমের ভিত্তি। সে আলোকেই মানবাধিকার বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক এডভোকেসির পাশাপাশি সহজে তথ্য জানার অধিকার এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সিএইচআরআই কাজ করছে। সিএইচআরআই-এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালার আয়োজন, পারস্পরিক জ্ঞান ও তথ্য বিনিময় এবং এডভোকেসি।

মানবাধিকার এডভোকেসি কর্মসূচী:

কমনওয়েলথ-এর আনুষ্ঠানিক দপ্তরসমূহ এবং কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সরকারসমূহের কাছে সিএইচআরআই নিয়মিত মানবাধিকার বিষয়ক স্মারকলিপি জমা দিয়ে থাকে। পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সিএইচআরআই বিভিন্ন স্থানে তথ্যানুসন্ধান দলও প্রেরণ করে। ১৯৯৫ সাল থেকে সিএইচআরআই নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ এবং সিয়েরা লিয়নে মিশন পাঠিয়েছে এবং কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ নেটওয়ার্ক-এর সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছে। এই নেটওয়ার্ক মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার গ্রুপগুলোর সাথে একত্রে কাজ করার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠেছে। এছাড়া সিএইচআরআই-এর মিডিয়া ইউনিটও মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা অব্যাহত রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

তথ্য জানার অধিকার:

তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান ও কৌশলগত দক্ষতা রয়েছে সিএইচআরআই-এর। এ বিষয়ে ফলপ্রসু আইনগত কাঠামো গড়ে তুলতে এবং অনুসরণমূলক কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সিএইচআরআই সহযোগী সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ এবং সরকারের সহায়কের ভূমিকায় কাজ করে। পাশাপাশি তারা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেও কাজ করে। এসব যৌথ কর্মকান্ডের লক্ষ্য হলো তথ্য অধিকার বিষয়ক কাজে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং নীতি-নির্ধারকদের তথ্য অধিকারের স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ করা।

সিএইচআরআই দক্ষিন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সম্প্রতি তারা ভারতে তথ্য অধিকার আইন পাসের উদ্দেশ্যে একটি সফল প্রচারাভিযান পরিচালনা করছে। তাছাড়া অতি সম্প্রতি তারা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনের খসড়া তৈরীতে সহায়তা দিয়েছে। তথ্য অধিকারের স্বপক্ষে ভূমিকা রাখতে এঅঞ্চলের জাতীয় ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সাথে সিএইচআরআই অনুঘটকের ভূমিকাও পালন করছে।

বিচার প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা:

পুলিশ বাহিনীর সংস্কার

অনেক দেশেই পুলিশ নাগরিকদের রক্ষাকারী না হয়ে রাষ্ট্রের নির্যাতনমূলক একটি হাতিয়ার হিসেবে অবতীর্ণ হচ্ছে। ফলে ঐসকল দেশে অধিকার লঙ্ঘনের ব্যপক ঘটনা ঘটে এবং বিচার প্রাপ্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয় অনেক মানুষ। সিএইচআরআই পুলিশ বাহিনীর দর্শনগত ও পদ্ধতিগত সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সিএইচআরআই মনে করে এ প্রক্রিয়াতেই কেবল পুলিশ তার বর্তমান নির্যাতনমূলক ভূমিকার পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। ভারতে সিএইচআরআই মূলত পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের স্বপক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধি ও জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্য কাজ করছে। পূর্ব আফ্রিকায় এবং গায়নায় সিএইচআরআই পুলিশ বাহিনীর জবাবদিহিতা এবং তাদের কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

কারা সংস্কার

ঐতিহাসিকভাবে কারা অভ্যন্তরে যে গোপনীয়তার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাতে স্বচ্ছতার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সেখানকার দুর্নীতি ও অন্যায়গুলো জনসম্মুখে তুলে ধরাই হলো সিএইচআরআই-এর কর্মসূচির মূল বিষয়। এক্ষেত্রে অন্যতম একটি কার্যক্রম হলো, কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কারাবন্দিদের যে আধিক্য তা কমাতে বিদ্যমান আইনগত সীমাবদ্ধতার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অসেচতনতায়, অবহেলায় বিচারের পূর্বেই অনেক কয়েদি বহুদিন ধরে বন্দি জীবন যাপন করছে, আবার অনেককে সাজার অতিরিক্ত সময় ধরে সেখানে থাকতে হচ্ছে। এসব বিষয়ে সিএইচআরআই পরিস্থিতি সহনীয় করতে কাজ করছে। তাছাড়া প্রায় নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর কারা পরিদর্শন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করাও সিএইচআরআই-এর মনোযোগের আরেকটি ক্ষেত্র। সিএইচআরআই মনে করে, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কারা প্রশাসনের সেবার মানন্নোয়নে পরিবর্তন আনা যেমন সম্ভব তেমনি বিচার প্রশাসনেও একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলা সম্ভব।

এই বইটি দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

বাড়ি নং ৮/১৪, বক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮-০২-৮১১৫৮৬৮, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১৪১৫১১
ই-মেইল: nu@nuhr.org, nu@bdmail.net
ওয়েবসাইট: www.nuhr.org

১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৭০-৭২, ৮৩১৭১৮৫, ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd
ওয়েবসাইট: www.blast.org.bd

কমনওয়েলথ হিউমেন রাইটস্ ইনেশিয়েটিভ
৫৫/এ সিদ্ধার্থ চেম্বারস্, (২য় তলা) কালু সরাই নিউ দিল্লী ১১০০১৬
ফোন: ৯১ ১১ ৪৩১৮০২০০; ৪৩১৮০২০১
ফ্যাক্স: ৯১ ১১ ২৬৮৬৪৬৮৮
ই-মেইল: info@humanrightsinitiative.org
ওয়েবসাইট: www.info@humanrightsinitiative.org

Delegation of the European Union to India
49, Sunder Nagar, New Delhi – 110003
Phone: +91-11-42195219
Fax: +91-11-41507206, 07
Website: http://eeas.europa.eu/delegations/ondia/index_en.htm

The contents of this report are the sole responsibility of BLAST and CHRI and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union. This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.